জীয়নকাটি

অন্নদাশঙ্কর রায়

ডি এম লাইব্রেরী
কলিকাতা

প্রকাশক

শ্রীগোপাল দাস মজুমদার

ডি এম লাইব্রেরী

৪২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট

কলিকাতা

এক টাকা চার আনা

মুদ্রক

শ্রীমিহির কুমার মুখোপাধ্যায়

টেম্পল প্রেস

২নং ন্যায়রত্ন লেন, কলিকাতা

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সেন, আই সি এস,

মহাশয়েষু

নিবেদন

গত মহাযুদ্ধের সময় একটি প্রশ্ন বার বার আমার কানে হানা দিত। সঙ্কটকালে সাহিত্যিকের কর্তব্য কী। এই প্রশ্নের উত্তর আমি নানাভাবে দিয়েছি। কোথাও প্রচ্ছন্নভাবে, কোথাও প্রত্যক্ষভাবে। এবার সেগুলিকে একসূত্রে গাঁথা গেল।

"মনে মনে" এই পুস্তকে স্থান পাবার দাবী রাখে না। বেচারি উড়ে এসে জুড়ে বসেছে আর কোনোখানে জায়গা নেই বলে। এই রচনা বিশ বছর আগে "কালিকলম"-এ প্রকাশিত হয়। তার পরে অদৃশ্য হয়। কবিবন্ধু জগদীশ ভট্টাচার্যের আনুকূল্য না পেলে এর পুনঃপ্রকাশ ঘটে উঠত না। তাঁকে ও তাঁর ছাত্রকে ধন্যবাদ।

লেখাগুলির উপর মাঝে মাঝে কলম চালিয়েছি, কিন্তু ছাপার ভুল নজর এড়িয়ে গেছে। "রম্যা রলাঁ" প্রবন্ধটির শিরোনামায় রলাঁ্যা কথাটি মুদ্রাকরপ্রমাদ। রলাঁ আমার অন্যতম গুরু, সুতরাং এই অশুদ্ধির জন্যে আমি লজ্জিত।

প্রচ্ছদপট শ্রীমতী লীলা রায়ের আঁকা।

অন্নদাশঙ্কর রায়

অন্নদাশঙ্কর রায় প্রণীত

প্রবন্ধের বই

তারুণ্য

আমরা

জীবনশিল্পী

ইশারা

দেশকালপাত্র

বিনুর বই

কবিতার বই

নূতনা রাধা

কামনাপঞ্চবিংশতি

ছোট গল্পের বই

প্রকৃতির পরিহাস

মনপবন

সূচী

দ্রষ্টব্য। বন্যা বর্ষা শীর্ষক প্রবন্ধটির শিরোনামায় বর্ষা শব্দটি ভুলক্রমে বর্ণা ছাপা হয়েছে।

জীয়নকাঠি

মনে মনে

১

টেমস নদীর কূলে বসে বঙ্গোপসাগরের কলরোল শুনছি। সে কলরোল নিকটে যেমন উচ্চ দূরে তেমনি ক্ষুদ্র।

দেশ থেকে যে সব পত্র ও পত্রিকা পাই সে সব পড়ে অস্পষ্টরকম বুঝতে পারি দেশে দু'রকম কবিওয়ালা কথার কুস্তি লড়ছেন।

দেশে কোনোরকম যুদ্ধ-বিগ্রহ নেই, রাজনৈতিক আন্দোলনটাও বোধ করি যথেষ্ট প্রচণ্ড নয়। পাছে দেশের লোক ঘুমিয়ে পড়ে, সেই ভয়ে তাদের কানের কাছে হুঙ্কার অভিনয় করতে হবে।

সবচেয়ে আমাকে লজ্জিত করেছে, রবীন্দ্রনাথও এর মধ্যে আছেন। কেউ কেউ বলেন তিনিই যে নাটের গুরু, কেউ কেউ বলেন অমলচন্দ্র ঘোষ। সৌভাগ্যক্রমে আমি "সাহিত্যধর্ম" ও "অতি-আধুনিক বাংলা কথা-সাহিত্য" দুটি লেখাই পড়ার সুযোগ পেয়েছি। তারপর যুদ্ধটা কতদূর এগিয়েছে সে খবর আমার জানা নেই। আশা করি, এতদিনে রবীন্দ্রনাথ পরাস্ত হয়ে শরশয্যা গ্রহণ করেছেন এবং ঘোষ মহাশয় রণে ভঙ্গ দিয়েছেন।

এমন আশা করবার কারণ এই যে, আমিও তরুণ, আর সব তরুণের এক রা। লাজ কেটে প্রবীণের দলে ভিড়ে যেতে ইচ্ছে থাকলেও পারিনে, পাছে বয়সের দোষে এমন একটা স্বর মুখ ছিঁড়ে বেরিয়ে যায় যা শুনে প্রবীণরা ভাববেন অভদ্র। তরুণরা বলবেন নাককাটা।

সুতরাং অদৃষ্টে যা থাকে কপালে শ্রেয়ঃ। আমি শেষ। আমি আশা করছি যে পিতামহদেব ও প্রপিতামহগণ এতদিনে আমাদের দোষগুণ প্রভৃতি জেনে ফেলেছেন ও মেনে নিয়েছেন। তাঁরা হাল ছেড়ে দিলে তাঁদের পদাঙ্কানুসরণকারীরাও যদি হাল ছেড়ে না দেন, তবে আমরা তাদের নৌকা বানচাল করবই। অতি-আধুনিক বাংলা সাহিত্যে অতি-আধুনিকদেরই জয় হতে বাধ্য। তবে কথা এই যে, আমাদের পরেও পুনশ্চ আছে, আমাদের তরুণী প্রিয়াদের কোলে যারা লালিত হবে তারাও একদিন তরুণ হয়ে উঠবে, ততদিনে আমরা প্রবীণ হয়ে তাদের পথ আগলে থাকলে তারা আমাদের গালে [illegible] কালি মাখিয়ে দেবে।

আমাদের সেই ভাবী শত্রুদের সৃষ্ট তরুণতর সাহিত্য কেমন হবে ও কি কি যুক্তি উদ্ভাবন করবে, তা একবার কল্পনা করতে সাহস হয় না। থাকবে প্রবীণদের খা খেয়ে খেয়ে অস্থির। কল্পনায় অজাতদের খা খেয়ে পাগল হয়ে যাবো। তারা যে আমাদের চেয়েও এক কাঠি সরেস হবেই এ তো স্বতঃসিদ্ধ। সুতরাং shocked আমাদের হতে হবে, তাদের দ্বারা। ততদিনে প্রবীণরা স্বর্গ থাকলে স্বর্গে থাকবেন, জন্মান্তর থাকলে তরুণতর হয়ে জন্মাবেন, সুতরাং তাঁদের ভয় নেই, [illegible] আছে। কিন্তু আমরা যখন ভগবান মানিনে, পরলোক মানিনে, জন্মান্তর মানিনে, তখন যতদিন না আমরা নির্বাপিত হই, অথবা মৃত্যুমাঝে নির্বাণ পাই, ততদিন আমাদের আমলের অর্বাচীনের মার সহ্য করতেই হবে।

মারের নমুনা দুটো একটা কল্পনা করতে চেষ্টা করি। আমাদের দলের সবচেয়ে সাহসী লেখকেরা এখন বই বোঝাই করে যত রকম দুঃখ দুর্দশা ব্যাধি বালাইয়ের তালিকা দিচ্ছেন তার মধ্যে চুম্বন আলিঙ্গন থেকে জ্বর হওয়া, শিশু হওয়া পর্যন্ত কিছুই বাদ যায়নি এবং তাঁদের

নায়কেরা কুকুরের সঙ্গে ভাগ করে আঁস্তাকুঁড়ের ভাত না পাওয়া পর্যন্ত যথেষ্ট পরিমাণে জীবন্ত হ'ন না। কিন্তু জীবনের আরো অনেক দিক আছে—একেবারে নগ্ন বাস্তবের চেয়েও নগ্নতর।

আমরা কাপড় খুলে মানুষকে বিবসন করা অবধি গেছি। ভাবী-কালের তাঁরা মানুষের চামড়া তুলে দিয়ে পেট চিরে নাড়ি ভুঁড়ি খুলে দেখবেন। ইউরোপের কোনো কোনো ডাক্তার ভবিষ্যদ্বাণী করছেন যে শিশু হত্যা তো ঘরে ঘরে চালাতে হবেই নরবংশের উৎকর্ষের খাতিরে, তার উপরে নারীদের জরায়ু বানরীদের দেহে রোপণ করে নারীদের ছুটি দেওয়া যাবে আরো বড় বড় কাজ করতে। বানরীরাই মানব সন্তানকে গর্ভে ধারণ করে মানব সমাজকে উপহার দেবে। সন্তানের পিতাকে নয়, পিতা থাকবে না, বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার দ্বারা জন্মক্রিয়া সম্পাদিত হবে, পুরুষও ছুটি পেয়ে ঢের বড় বড় কাজ করবে কি না!

এখন অনুমান করুন আমাদের অতি-অনাগত সাহিত্যের কেমন চেহারা হবে! তাতে চুম্বন আলিঙ্গন থাকবে না, নর ও নারী উভয়েই drone। বানরীই রাণী-মক্ষিকা। যৌন সমস্যা থাকবে না, সব বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির ব্যাপার। আস্তাকুঁড়ে ভাত খুঁটে খাওয়া থাকবে না, খিদে পেলে ইঞ্জেকশন নিতে হবে। শুনেছি আত্মহত্যারও একটা উপায় করা হবে।

কি নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি হবে তাই ভাবছি। প্রেম তো দূরের কথা, কামই থাকবে না। হৃৎপিণ্ডটা যদি অস্ত্র করে তুলে নেওয়া হয় তবে বেদনা কথাটাও জীবন থেকে, সুতরাং সাহিত্য থেকে উঠে যাবে! আদিরস করুণরস যদি না থাকে তবে বোধ করি বীভৎস রসই সাহিত্যের আসর দখল রাখবে।

কিন্তু ততদিনে সাহিত্য আদপেই থাকবে কিনা ঠিক নেই। সাহিত্যকে

আমরা বাংলার তথা ভারতের রাশিয়ার আমেরিকার তরুণেরা আস্তা-কুঁড়ের ভাত খাইয়ে যেমন রোগা করে এনেছি সে বেচারা ততদিন টিঁকে থাকলে হয়! সাহিত্যই যদি না থাকে, তবে সাহিত্যধর্ম! মাথা নেই তার মাথা ব্যথা!

২

German Youth Festival-এর ছবি দেখতে দেখতে হঠাৎ মনে পড়ে গেল আমাদের তরুণ তরুণীদের কথা। এক সঙ্গে সহস্রাধিক তরুণ athlete ও তরুণী athlete-এর শোভাযাত্রার উপরে পথপার্শ্ববর্তী সৌধশিখর হতে পুষ্পবৃষ্টি হচ্ছে, পতাকা উড়ছে, জনতা ঝুঁকে রয়েছে। সকলের মুখে হাসি, সকলের দেহে স্বাস্থ্য। মেয়েরা পরেছে ছেলেদের মত খেলার পোষাক, হাত পা মুখ খোলা, চুল ছাঁটা, বুকের উপরে নম্বর লেখা। পাশাপাশি চলছে, কে তরুণ, কে তরুণী প্রথম দৃষ্টিতে বোঝা যায় না।

অনেকদিন থেকে ভুলে গিয়েছিলুম আমাদের দেশে পর্দা-প্রথা আছে, বাইরের মেয়েদের মুখ দেখতে পাইনে, ঘরের মেয়েদের সঙ্গ পাওয়াও বিদ্যার্থীর বা কেরাণীর পক্ষে দুর্ঘট। অথচ আমরা যারা সাহিত্য লিখি ও বড় সাহিত্যিক বলে নিন্দিত হই তারা অধিকাংশই বিদ্যার্থী কিংবা কেরাণী। আমাদের সঙ্গে আমাদের সমান শ্রেণীর সমবয়সিনীদের ঘরে বাইরে কোথাও একটুকু চোখের দেখাও ঘটে না। আমরা ষোলো বছর বয়সে পাড়াগাঁকে ছেড়ে শহরে আসি। মেসে ভর্তি হই, সাত আট বছর পরে বিদ্যাস্থান থেকে চাকুরীস্থানে প্রমোশন পাই এবং যদি না ইতিমধ্যে কোনো কন্যাদায়গ্রস্ত ভদ্রলোককে দায়মুক্ত করি তবু কন্যাটির সঙ্গে ছুটি না পেলে দেখা করতে যাইনে।

এমনি একান্ত নারীবর্জিত জীবন থেকে যে সাহিত্যের উদ্ভব সে সাহিত্য প্রাণহীন সত্তাহীন আন্তরিকতাহীন না হয়ে যায় না। মানসীকে নিয়ে আমরা বহু কবিতা গাঁথি ও গল্প ফাঁদি বাস্তবীকে নিয়ে তার শতাংশও পারিনে। পশ্চিমের রক্তমাংসের সাহিত্যে কত উত্তাপ, কত আলো! রক্তমাংসের নারীকে নিয়ে তাদের কারবার। তাদের passion-এর সঙ্গে আমাদের passion-এর তুলনা যেন সূর্যের সঙ্গে জোনাকির আগুনের তুলনা। আমাদের যাঁরা কামের কবিতা লেখেন তাঁরা কেবল কথার উপরে কথা জড়ো করেন, আবেগের সঙ্গে আবেগ জুড়ে দেন। সে সব কবিতার যাঁরা সমালোচক সাজেন তাঁরা বোঝেন না যে সত্যিকারের একটা কামের কবিতা লেখার সাধ্যও আমাদের নেই। আমরা কামের ভান করি শুধু কামের স্ফূর্তি পাইনে বলে। স্ফূর্তি পেলে কাম দু'দণ্ডেই প্রেমে রূপান্তরিত হতো, ক্ষুধা তৃপ্তির পরে সুধা খুঁজত, 'কড়ি ও কোমলের' কবি 'মানসী'তে লিখেছেন, "ক্ষুধা মিটাবার খাদ্য নহে যে মানবী!"

অল্পবয়সী কবিমাত্রেই কামের কবিতা লিখে থাকেন। কালিদাস "ঋতুসংহার" লিখেছিলেন। Shakespeare লিখেছিলেন "Venus and Adonis"। এখনকার ইউরোপের কবিরাও লেখেন। কিন্তু তাঁদের একটা স্বাভাবিক পরিণতি আছে। তাঁরা কুঁড়ি থেকে ফুল ও ফুল থেকে ফলে পরিণত হন। কিন্তু আমাদের সমাজের গড়ন এমন অদ্ভুত যে আমাদের এখনকার কবিরা কুঁড়িতেই থাকেন কিংবা পচেন।

ত্রিশ বছর আগেও আমাদের পুরুষরা অল্প বয়সে বিবাহ করত, বাইরের নারীকে না জানলেও ঘরের নারীকে জানত। বহুকাল থেকে আমাদের দেশে নারীকে জানবার একমাত্র উপায় ছিল তাকে ঘরে এনে জানা। একজন একটি গল্পে লিখেছেন—বাঙালীর মেয়েকে জানতে হলে তাকে বিয়ে করতে হয়। আমাদের আগের generation-

এর ভক্তেরা তেমনি করে জেনেছিলেন। তাঁদের কবিতা দাম্পত্য কামের ও দাম্পত্য প্রেমের কবিতা। বিয়ে না করেও যে ভালোবাসতে পারা যায় এটা তাঁদের চোখে দুর্নীতির মতো ঠেকত। ভালোবেসে বিয়ে করা তাঁদের কাছে অপরাধ বলে গণ্য হতো।

কিন্তু টে ডি নো দিবসাঃ গতাঃ। আমাদের বয়ঃসন্ধি কাটে প্রবাসে অবিবাহিত অবস্থায়। ঘরের নারী, বাইরের নারী দুইই আমাদের কাছে দুর্লভ। অগত্যা আমরা মানসীর উদ্দেশে এমন কবিতাও লিখি যা কোনো রক্ত মাংসের নারীর উদ্দেশে লিখলে তিনি আমাদের ধিক্কার দিতেন। এ কবিতা আদিরসাত্মকও নয়, বীভৎসরসাত্মক। এর ভোগকামনাতে রাজসিকতা নেই, এর পূজাকাঙ্ক্ষাতে সাত্ত্বিকতা নেই। এর ভাবে আগাগোড়া তামসিকতা। এ কবিতা পানওয়ালীর বা মেথরের ঝি'রও বোধ্য। দুঃখের বিষয় তাদেরও সত্যি করে জানতে আমাদের সাহসে বা আত্মসম্মানে কুলোয় না। স্বদেশে ওরাই আছে, আমরা যাই বলি না কেন আমরা বুর্জোয়া, আমরা কুলি মজুরকে নিয়ে দু'শো পাতার নভেল লিখতে পারি কিন্তু তাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পাল্কী বইতে পারিনে, তাদের সঙ্গে একাত্ম হতে পারিনে। ভালোবাসতে পারি, কিন্তু মন জানতে পারিনে, মন কল্পনা করে কাগজ ভরাই। এই আমাদের ডেমোক্রাটিক সাহিত্য। শ'খানেক বছর পরে পানওয়ালী ও পাল্কী বেহারার দল যখন সাহিত্য সৃষ্টি করবে তখন আমাদের রচিত তাদের মনস্তত্ত্বকে যাদুঘরে রেখে আমাদের মনস্তত্ত্ব গবেষণা করবে। শরৎবাবুর মেয়েরা কি তাঁর নিজের স্তরের মেয়ে। দৈবক্রমে অস্থানে পড়েছে। নিজের আত্মীয়ার মন বুঝে শরৎবাবু তার মন কল্পনা করতে পারেন। তাই "সাবিত্রী"কে এত জীবন্ত মনে হয়। অচিন্ত্য বাবুর "মুক্তদি" কি এমনি জীবন্ত?

আমাদের স্তরের মেয়েদের সঙ্গে আমাদের যোগ নেই, এইটে

আমাদের অধিকাংশের দুর্ভাগ্য। পারিবারিক প্রেমের দিন চলে গেছে, সামাজিক প্রেমের দিন আসেনি, মাঝখানে দাঁড়িয়েছে পর্দার প্রাচীর ও লোকনিন্দার কপাট। আমাদের স্কুলগুলো কলেজগুলো যতদিন না শান্তিনিকেতনের মতন হয় ততদিন আমাদের তরুণ কবিরা সঙ্গিনীকে শ্রদ্ধা না দিয়ে কামিনীকে কামনা নিবেদন করবেন। আমাদের আপিস-গুলো যতদিন না মেয়ে-কেরাণীতে ছেয়ে যায় ততদিন আমাদের তরুণ গল্প লেখকেরা পানওয়ালীর বা মেসের ঝি'র ছাড়া আর কারুর মন বুঝতে মন দেবেন না। সমালোচকেরা নিন্দা করছেন, করুন; কিন্তু বরং পানওয়ালীরও মন বুঝতে চাইলে বোঝা যায়, সমস্তরের অনাত্মীয়ার মন বুঝবার উপায় নেই। আমাদের ভদ্র সমাজে অনাত্মীয়ের সঙ্গে অনাত্মীয়ার মেলামেশা এত অল্প যে আমাদের অধিকাংশ সাহিত্যিককে দুধের সাধ ঘোলে মেটাতে হয়। এবং যে বয়সে আমরা কাব্য লিখতে আরম্ভ করি সে বয়সে আত্মীয়ার সঙ্গেও আমাদের অধিকাংশের যোগ থাকে না, আমরা মেসে হোটেলে নির্বাসিতের মতো বাস করি। ইউরোপের তুলনায় আমাদের ছাত্র জীবন যে কি ভয়ানক নীরস ও নির্জীব তা মিলিয়ে না দেখলে বিশ্বাস হয় না।

পুরুষের পক্ষে নারীর সান্নিধ্য সব বয়সেই অবশ্য প্রয়োজনীয়। শৈশবে কৈশরে যৌবনে বার্দ্ধক্যে। এটা একটা axiom বা স্বতঃসিদ্ধ বলে স্বীকার না করলে সমাজের ও সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হবে না। যখন আমাদের সমাজে বাল্যবিবাহ ও একান্নবর্ত্তী পরিবার ছিল তখন জীবিকার জন্যে বিদ্যাধ্যয়ন ও স্ত্রীকে ছেড়ে প্রবাসে থাকা ছিল না। তখন গুরুগৃহে বিদ্যার অন্বেষণে গেলেও গুরুকন্যার সান্নিধ্য পাওয়া যেত। এখন আমাদের সমাজের পতন যা হয়েছে তা দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়! ন্যাকামীর নাম দেওয়া হয়েছে নীতি! নারীকে চোখে দেখতে না পাওয়াটাই নাকি ব্রহ্মচর্য! মানুষের স্বাভাবিক ক্ষুধা তৃষ্ণাকে নিরক্ষিত

খাবার না দিয়ে তাকে উপবাস করতে শেখানোই বুঝি সমাজপতিদের কর্তব্যের শেষ সীমা! ইংলণ্ড-ফ্রান্স-জার্মানী-রাশিয়ার সমাজপতিরা কিন্তু সমাজের গড়ন বদলাবার সঙ্গে সঙ্গে সমাজের তরুণ তরুণীদের জীবনব্যবস্থাও বদলে দিয়েছেন। তাই এসব দেশে নীতি উপদেশ দিতে শুনতে কাণ ঝালাপালা হয় না; ছেলেমেয়েরা নিজেদের নীতি নিজেরাই ঠিক করে নেয়; প্রচুর খেলাধূলা ও কায়িক পরিশ্রম করতে করতে যে ব্রহ্মচর্য্য শৈশব থেকে গড়ে ওঠে সে ব্রহ্মচর্য্য একত্র বিহারের ও অমিতাচার সত্ত্বেও তাদের দেহমনকে শক্ত রাখে; এবং বীরত্বের দীক্ষা দিতে দিতে তরুণ-তরুণীরা পরস্পরকে অর্জ্জন ও রক্ষা করতে শেখে।

পাপ কি এসব দেশে নেই? অতি অগণ্য পাপ। কামকবিতা কি এসব দেশে নেই? যথেষ্ট আছে। কিন্তু সমালোচকেরা বসে বসে বুদ্ধি খাটাচ্ছে না। লেখকরাও জোর করে তাদের ক্ষ্যাপাচ্ছে না। জীবনকে নিয়ে এদের হাজারো experiment। কোনোটাতে আসক্ত হতে কেউ চায় না। আজ কলেজে পড়ছে, কাল Air Forceএ নাম দিয়ে দূরদেশে উড়ে যাচ্ছে। পরশু ক্যানাডায় জমির খোঁজ নিয়ে চাষ করছে। তার পরদিন নভেল লিখছে। চারদিন চারজন চার-রকম নারীর সঙ্গে পরিচয়। তারা জলজ্যান্ত নারীই, তারা কামের সুর বদলে প্রেমের সুর দাবী করে। তারা প্রেমনিবেদন পেলে যোগ্যতার নিদর্শন পেতে চায়। তারা কামিনী হয়ে তুষ্ট হয় না, স্বামিনী হবার স্পর্দ্ধা রাখে। এসব নারীর কণ্ঠে যারা কবিতা লেখে তাদের অশ্লীলতা এত স্বভাবী যে কেবল আদি সমালোচনাকে ত্রস্ত করে "শনিবারের চিঠি" খাটতে হয় না।

বৈশাখের "হসন্তিকা"র পাতা উল্টাতে উল্টাতে চোখে পড়ল—ছাত্রাদের লেখা শুধু মেয়েদের জন্য।" এই রসঘন বাক্যটি "হসন্তিকা"র

নিজের রচনা নয়। এটি তাঁরা 'ফন্দী ফুন্দী'র মুখ থেকে কেড়ে নিয়েছেন। শুধু "ফন্দী ফুন্দী"! এই একটিমাত্র বাক্য দিয়ে কেবল আমাদের তরুণ সাহিত্যকে কেন, আবহমানকালের বিশ্বসাহিত্যকেও চুম্বকে বোঝানো যায়। শুধু সাহিত্য নয়, চিত্র ভাস্কর্য সঙ্গীত থেকে যুদ্ধ-বিগ্রহ পর্যন্ত ছোটবড় সব কিছুই তো মেয়েদের ফন্দী, নারীর মন পাবার জন্যে মন রাখবার জন্যে পুরুষের সৃষ্টি। হেলেনকে ধরে নিয়ে ঘরে রাখবার ফন্দী ট্রয়ের যুদ্ধ। মমতাজকে মরণের পরে ধরে রাখবার ফন্দী তাজমহল। "তোমাদের লেখা শুধু মেয়েদের ফন্দী"—এই একটিমাত্র সূত্র বেয়ে সমস্ত সৃষ্টিতত্ত্বের মূলে পৌঁছানো যায়। Rolland তাঁর আধুনিকতম উপন্যাসের উপরে উদ্ধৃত করেছেন, "Before all else was Passion and Passion engendered Thought" (Rig veda)! মানুষের মন পাবার জন্যে ভগবানের এই যে সৃষ্টি এটাও একটা ফন্দীই, একটা Thought; এবং এর মূলে রয়েছে তাঁর Passion—কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি (ঋগ্বেদ)।

আমাদের লেখা যদি মেয়েদের ফন্দী হয়ে থাকে তো আমাদের লজ্জার কিছু নেই। মেয়েদের না হলে আমাদের চলে না। নারীকে পুরুষের বড় দরকার। যে বয়সে কোকিলাকে ডেকে ডেকে কোকিলের শ্রান্তি ধরে না আমাদের সেই বয়স। আমাদের কুহু ডাকই আমাদের সাহিত্য। এ সাহিত্য আদিকাল থেকে রচিত হয়ে আসছে এই একটি কথাকে অবলম্বন করে যে "তোমাকে আমার বড় দরকার তোমাকে আমি চাই।" আমাদের যুগ যুগ সঙ্গিনী রাধা 'ধরিলে তো ধরা দিবে না', তবু তাকে ধরবোই বলে আমাদের পণ; তাকে ধরবার জন্যে আমাদের শিরে শিখি-চূড়া, গলে বনমালা, হাতে বাঁশী, পায়ে কালীয় নাগ। জটিলা কুটিলা যদি বলে, "তোমাদের লেখা শুধু মেয়েদের ফন্দী" তবে আমাদের লজ্জার কিছু নেই। তাদের মুখে ফুল চন্দন পড়ুক।

কিন্তু নিজেদের সঙ্গে আমাদের বোঝাপড়া করবার আছে। যাকে

ধরবার জন্যে আমাদের লক্ষ্মী সে কি বড় সহজ নারী? তাকে দুটো চাটু কথা শোনালেই সে ধরা দেবে? কিন্তু সে কি শুধু তার দেহখানি যে দেহের স্পর্শ তার মরমে পশিবে? দেহ সত্য, দেহ সুন্দর, দেহ অনির্বচনীয় অদ্ভুত; কিন্তু দেহই তো সে নয়। দেহ তার। "Love me? Love my dog" এই নীতি অনুযায়ী যে প্রেমিক প্রিয়ার বদলে প্রিয়ার Lap dog টিকেই ভালোবেসে ফেলে তার মতো কৃপাপাত্র আর নেই। এ যেন রাজপ্রাসাদের প্রবেশপথে দ্বারীকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত। দ্বারী লোকটা সত্য, কিন্তু শেষ নয়। তাকে দুটো মিষ্টি কথা বলতে পারি, দু'গিনি ঘুষ দিতে পারি, কিন্তু তার কাছে দাঁড়িয়ে রইব না, তাকে ছাড়িয়ে এগিয়ে যাবো। নইলে অভিমানিনী রাণীর দেখা পাবো না, বড় বঞ্চিত হবো।

বহুকাল থেকে আমাদের দেশে—শুধু আমাদের দেশে কেন, ইউরোপেও দুটি দল আছেন। একদল দেহকে মিথ্যা বলে দ্বারীকে ফাঁকি দিতে চেয়েছেন, দ্বারী তাদের গলাধাক্কা দিয়ে খেদিয়ে দিতে ছাড়েনি। আর একদল দেহকে চরম বলে দ্বারীর কাছে হাত যোড় করে রয়েছেন, দ্বারী তাদের ভেতরে যাবার পথ বলে দেয়নি। এই দু'দল ascetic ও epicure, বাবাজী ও বাবু মিলে এক দারোয়ানী সাহিত্য বানিয়েছেন, তার একদিকে দারোয়ানকে ফাঁকি দেবার মন্ত্রতন্ত্র আর একদিকে দারোয়ানের মাহাত্ম্যবর্ণন। ঢালের দুই দিকেই দারোয়ানজীর ছাপ। Platonic love ও লাম্পট্য প্রেম যেন বহুরূপীর রঙ পরিবর্তন।

গত শতাব্দীতে আমাদের দেশে ঘোরতর Puritanismএর চর্চা হয়ে গেছে। রামকৃষ্ণমিশন ও ব্রাহ্মসমাজের প্রাচীনরা দেহের নামে বিভীষিকা দেখেছেন, ভোগকে ভেবেছেন বিলাস, সম্ভোগকে বলেছেন অশ্লীলতা। তার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ এখন হয়েছে Restoration যুগ।

Roundheadদের মাথা মুড়িয়ে Cavalierরা পরচুলা পরেছেন। ক্রমওয়েলের আমলে যে দেশে গান বাজনা নাচ অভিনয় নিষিদ্ধ ছিল ও বিশুদ্ধ বাইবেল ছাড়া আর কোনো বই লোকের হাতে দেওয়া যেত না, চার্লস দি সেকেণ্ডের আমলে সেই দেশে পঞ্চ ম-কারের জয়জয়কার। নারীর সম্মান? নারীর সম্মান সে যুগেও ছিল না, এ যুগেও নেই। তারা নারীকে কামিনী বলে কাঞ্চনের সঙ্গে ত্যাগ করেছিল। এরাও নারীকে কামিনী বলে মদের দোকানে সাকী বানিয়েছে। শোনা যায় সেকালের কোনো প্রসিদ্ধ নীতিবাগীশ বেশী বয়সে বিবাহ করায় লোকে বলে, তিনি প্রেমে পড়ে বিয়ে করেছেন। এই কুৎসা শুনে নীতিবাগীশ মহাশয়ের নাকি টাইফয়েড্ জ্বর হয়ে গেল। আজকালকার তরুণতরুণ কচি ও কাঁচারা এই সব খাকা ও পাকাদেরই তো নাতি। তাই দাদা-মহাশয়দের মতো এরাও রটিয়েছে প্রেম মানে কাম।

তাঁরা করেছিলেন জীবনের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া, এরা করছে প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া। নিন্দার ভাগ কি কেবল এরাই পাবে ওঁরা পাবেন না? আস্ত নারীটিকে ওঁরা কেটেছেঁটে নাম দিয়েছিলেন 'মা'—মা না বলে নারীর প্রতি শ্রদ্ধা দেখান যেত না। অর্থাৎ কামিনীর কবল থেকে নিরাপদ হওয়া যেত না। নারীকে একটা incestএর সম্বন্ধে স্থাপন করে তার সঙ্গে প্রেমের সম্বন্ধ অস্বীকার করাটা কোন্ জাতীয় মনোভাব তা Freudকে ডাকলে তিনি সাক্ষী দিতে পারেন। এই সব মাতৃপূজকদের নাতিরা এখন শিং বেঁকিয়ে দাঁড়িয়েছে। এরা 'হাবা হাবা' (অর্থাৎ অবা অবা) করবে না। এরা বলবে, "রমণীর রূপরাশি করি উপাসনা।" এরা বন্দেমাতরম্ বলবে না। এরা বলবে, "বন্দে প্রিয়াং বন্দে মোহিনীং।" এরা যে "রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের আদর্শে সাহিত্য রচনা করছে না" একজে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দই দায়ী।

কিন্তু প্রতিক্রিয়ার প্রয়োজন বড় ক্ষণপ্রয়োজন। আমাদের এ আবার প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া। ভজন ভোজ্! বাবাজীদের মুখ ভেংচাতে গিয়ে আমরা অনেকেই বাবু হয়ে পড়ছি। দেশে ও বিদেশে একটা স্বৈরতার জোয়ার এসেছে। স্বৈরতা নারীর প্রতি সম্মানকর নয়। মেয়েদের কন্ঠীটা যদি সস্তা হয় তবে যে মেয়ে ধরা পড়ে ও যে পুরুষ ধরে তারা যেন নীলামী জিনিষ ও নীলামী জিনিসের খরিদ্দার। সস্তার আসবাবে ঘর বোঝাই করা এক বিড়ম্বনা। শ্মশানবিলাসী বাবাজী ও সস্তাবিলাসী বাবু দুই-ই সমান বিড়ম্বিত। রমণীকে উপাসনা করবার কথা ওঠে কেন? উপাসনা যদি করতেই হয় তবে একটিমাত্র রূপে কেন? মাতাকেই বলো, প্রিয়াকেই বলো, বন্দনা করবার দরকার নেই। ভালোবাসি, সর্বরূপে ভালোবাসি—নারী সম্বন্ধে পুরুষের এই কথাটাই শ্রেষ্ঠ, এতে কোনো পক্ষের সম্মান বা অভিমান নেই। এতে দেহ মন আত্মা সবগুলোরই যথাস্থান আছে। নারী পুরুষের প্রিয়াই বটে, জননীরূপে প্রিয়া, ভগিনীরূপে প্রিয়া, জায়ারূপে প্রিয়া, কন্যারূপে প্রিয়া, কিন্তু উপাস্যা বা বন্দনীয়াও নয়, ঘৃণ্যা বা বর্জনীয়াও নয়।

অতএব আমাদের মেয়েদের কন্ঠীটাকে এমন করতে হবে যাতে মেয়ের সবটা ধরে ও তার কোনো রূপ বাদ পড়ে না। এ কন্ঠী যে আমরা ছাড়তে পারব না এ তো স্বতঃসিদ্ধ। যতদিন জগতে মেয়ে থাকবে ততদিন মেয়েদের কন্ঠীও থাকবে। আমাদের কর্তব্য কেবল কন্ঠীটাকে মেয়ের উপযুক্ত করা। আমাদের সাহিত্য যেন বারোয়ারী সাহিত্য না হয়ে ঘরকন্নাই সাহিত্য হয়। এই আমাদের লক্ষ্য হোক। তাহলে ঘাটবাটীর কোণের পদ্মপাতার তলায় ঢাকা বরণমালাটি একদিন গলায় পরবার সৌভাগ্য লাভ করতে পারব।

এ গেল আমাদের দিককার কথা। এবার একটু তন্বী-তরুণীদের দিককার কথা হোক।

"বিগড়েছে বালিকারা কলেজের ছাত্রী
তাই তাঁর ঘুম নেই চোখে দিনরাত্রি।"

এই নন্দী-ভৃঙ্গীদেরকে কলেজের ক্ষুদ্রপোষ্য নাবালিকাদের Chaperon পদে কে বহাল করলে? মেয়েরা আমাদের শত্রু, আমরা তো ও কাজ করবোই; নন্দী-ভৃঙ্গীকে মেয়েরা পার্শ্বরক্ষী করলে যে ছাড়া পাবে এমন শান্তি মেয়েদের তো হবার কথা নয়। তবে কি নন্দী-ভৃঙ্গীরা সেক্সলেস? কিন্তু হয়ত মেয়েরাই তাদের শিখণ্ডী সাজিয়ে যুদ্ধ দেখতে চায়। "কমলিকা"তেই দেখছি "বিশ্বপ্রেম" নামক নক্সাটিতে "বিশালাক্ষী" নামক মেয়েটিকে বানানো হয়েছে injured innocent, যেন একটা বোবা কুকুরছানা বা একটি জড় পদার্থ। তাকে তার স্বামীর কাছ থেকে যে ফুঁসলে নিলে সমস্তটা দোষ তারই ও লেখকে সবটা সাজাও সেই লম্পটটার। আমাদের তরুণীকুলের খাসা সার্টিফিকেট! সত্যিই যদি তাঁরা এত ভালোমানুষ হয়ে থাকেন তবে তাঁদের জন্যে সার্বিক পাহারাওয়ালা যোগাবেন না রেখে আইন করে দেওয়া হোক যে মেয়েরা ঘটি-বাটি সোনা-দানা জাতীয়; তাঁরা কলেজে পড়লেও, বয়স বাড়লেও মাসিকপত্র বা নভেল নাটকের দ্বারা তাঁদের মন চুরি করাটা একটা larceny জাতীয় ক্রাইম্।

দেশের মেয়েরা কেবল লেখা পড়েন না, লেখেনও। সুলেখিকা বলে অনেকেরই সুখ্যাতি আছে। তরুণে প্রবীণে এই যে "সাহিত্য সংগ্রাম" চলেছে এতে ছোট বড় মাঝারি অনেক লেখকই তো যোগ দিলেন; কই কোনো লেখিকাকে তো দেখা গেল না? "বঙ্গনারী" কেন তরুণদের মারেজা করলেন না? অনুরূপা দেবী কেন তরুণীরক্ষার উপায় বলে দিলেন না? ইন্দিরা দেবী কেন শান্তিজল ছিটোলেন না? নারীনেত্রীরা নীরব। স-রব কেবল তাঁদের আত্মনিযুক্ত পার্শ্বরক্ষীরা। রাজার চেয়ে রাজার পারিষদদের গলার আওয়াজ উঁচু।

আমাদের এই রেডিও টেলিভিশন এরোপ্লেনের যুগে আমাদের কাছে দেশের চেয়ে দূর সত্য, এইটি আমাদের নিগূঢ় অপরাধ। আমরা যখন কলকাতায় বসে বাংলা লিখি, তখন মস্কোতে বসে যিনি [illegible] লিখছেন ও অসলোতে বসে যিনি নরওয়েজিয়ান্ লিখছেন তাঁদের সঙ্গে মনে মনে বেতার বার্তা বিনিময় করি। সাহিত্যরাজ্যের কোটালের দল জানেন, এরা পাজী, হামসুনকে নকল করছে। সাহিত্য-সম্রাটের দরবারে এদের ধরে নিয়ে গেলে এদের মাথায় ঘোল ঢালবার হুকুম পাওয়া যাবে। তাঁরা নিয়েও গেলেন ধরে। সাহিত্য-সম্রাট অতি উদার লোক, সাজা না দিয়ে sermon দিলেন। কিন্তু তাতে কার কতটুকু উপকার হলো এখনো জানতে পারিনি।

তরুণদের দিক থেকে অনেক কথা বলবার আছে। প্রথমত আমরা শুধু বাংলার জনকয়েক নই, আমরা সব দেশের অসংখ্য জন। এ কথাটা শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত ছাড়া অন্য কাউকে স্বীকার করতে দেখিনি। অতি-আধুনিক বাংলা সাহিত্য আসলে অতি-আধুনিক বিশ্ব সাহিত্য। বাংলার তরুণ হামসুনের প্রাণের কথা প্রাণে অনুভব করছে, তাই তার লেখা হামসুনের নকল নয়, হামসুনের দোসর। হতে পারে তার ক্ষমতা অল্প, তার হাত কাঁচা, তার অভিজ্ঞতা ভাসা ভাসা। হামসুনের প্রতিভা হয়ত তার নেই। কিন্তু হামসুনের প্রাণ তার আছে, সে প্রাণ অসুন্দরকে দেখে বেদনা পায়, ভাষায় প্রকাশ না করতে পেরে হাঁপায়। হাঁপানীর লক্ষণাক্রান্ত ভাষায় না থাকে কর্তা না থাকে কর্ম, তার আগাগোড়া ভাববাচ্য। এই হাঁপানী রোগটি এখনকার ইউরোপের অধিকাংশ লেখকদেরও আছে। Rollandর নেই কি?

দ্বিতীয়ত আমরা বিষয়কে প্রাধান্য দিচ্ছি, রূপকে অবহেলা করছি, সত্যি। আমরা আর্টিস্ট যতটা নই ততটা প্রোপাগ্যাণ্ডিস্ট, আমরা আর্টকে প্রোপাগ্যাণ্ডার বাহন করেছি। আমরা মুখে যাই বলি না কেন কাজে প্রমাণ করি art for propaganda's sake। আমাদের কারুর উদ্দেশ্য সমাজ সংস্কার, কারুর উদ্দেশ্য রাষ্ট্রবিপ্লব, কারুর উদ্দেশ্য নরনারীর স্বাধীন সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা, কারুর উদ্দেশ্য স্ত্রী পুরুষের সমান অধিকার প্রচার। উৎকট realist বলে যাঁদের নাম ডাক তাঁরাও মনে মনে উৎকট idealist—যথা বার্নার্ড শ'। ওমর খৈয়ামের মতো আমাদের সকলেরই মনোবাঞ্ছা—"to grasp this sorry scheme of things entire to shatter it to bits and to remould it nearer to the heart's desire."

পূর্বকালের সাহিত্যিকদের সঙ্গে আমাদের গোড়াতেই অমিল। তাঁদের সৃষ্টি তাঁদের নিরুদ্দেশ্য লীলা। তাঁদের হাতে কাল অন্তহীন, তাঁরা এক একটি রসাত্মক বাক্য লেখবার জন্য বছরের পর বছর অপেক্ষা করতে পারতেন। এক একটি মন্দির গড়তে তাঁদের শত শত বছর লাগত। কালিদাসের বা Shakespeare-এর লেখা পড়লে মনে হয় না যে তাঁদের কালে কোনোরকম সমস্যা ছিল বা সে সমস্যার তাঁরা কোনোরকম সমাধান দিতে চেয়ে কিংবা দিতে না পেরে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে গিয়েছিলেন। মেঘদূত বা Tempest যেন এ জগতের নয়।

কিন্তু ইতিমধ্যে জগতের তুমুল পরিবর্তন ঘটিয়ে দিলে Industrial Revolution। বাষ্পচালিত যন্ত্রের উদ্ভাবনে মানুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বহুগুণ হয়ে গেল। মানুষ রেলে ছুটল, জাহাজে সাঁতার দিলে, এরোপ্লেনে উড়ল। হঠাৎ দেখা গেল পৃথিবীটা এতটুকু ইংলণ্ড বা এতটুকু ভারতবর্ষ নয়। এর সমস্যা যে কত ব্যাপক ও কত বিপুল তা তো Shakespeare বা কালিদাস কল্পনাও করতে পারতেন না। বুদ্ধদেব দেখেছিলেন জরা

মৃত্যু ব্যাধি। তাইতেই তাঁর মাথা ঘুরে গিয়েছিল। আমরা দেখছি অন্যায় অত্যাচার নৃশংসতা নির্বোধতা কদর্যতা অসহায়ত্ব—দেশব্যাপী পৃথিবীব্যাপী চরাচরব্যাপী।

কালিদাসদের ছোট একটি গ্রামে বা নগরে যা ঘটত তার বেশী তাঁরা দেখতে শুনতে পেতেন না। আমরা কিন্তু কলকাতায় বসেও সমগ্র পৃথিবীতে বাস করি। খবরের কাগজ রোজ সকালেই আমাদের মন খারাপ করে দেয়, খারাপ মন নিয়ে গলিতে বাহিরে গিয়ে দেখি সবই খারাপ। কোথাও দাঙ্গা, কোথাও আত্মাহুতি, কোথাও গুণ্ডা, কোথাও কয়েদী। এবং যেন Infernoর পর্দা খুলে গেছে, আমরা দেখছি এই পৃথিবীটাই যে Inferno। এটা আমাদের পূর্বপুরুষদের চোখে পড়েনি। আমরাই কলম্বাসের মতো আবিষ্কার করলুম। সত্যের সঙ্গে সুন্দরের যে কতখানি ব্যবধান তা আমরা যেমন বুঝি তাঁরা কি তেমন বুঝতেন?

বিষয়ের কথা হচ্ছিল। আমরা দেখছি এত বিষয়ে এত লেখবার আছে যে মাত্র গোটা কয়েক বিষয় নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করতে আমাদের [illegible] হয় না। চাঁদ কোকিল দখিন হাওয়ার উপরে চোদ্দ বছর থেকে [illegible] বছর অবধি কবিতা লেখা আমাদের চোখে ক্রিমিনাল। রবীন্দ্রনাথ কি এসব লোক? তিনি কালিদাসের কালের লোক। উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বেকার জগৎ থেকে তিনি আমাদের জগতে উড়ে এসেছিলেন। তাঁর বার্তা উপনিষদের বার্তার মতো অমৃত আনন্দের বার্তা। সে বার্তা যখন শুনি তখন মনে হয় না যে শহরে শহরে slum আছে, গ্রামে গ্রামে শ্মশান, ঘরে ঘরে যক্ষ্মা আছে, দেশে দেশে যুদ্ধ। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে আজ পর্যন্ত সব দেশের সাহিত্যে বিরাট একটা ভূমিকম্পের ভাব দেখি, যা নীচে ছিল তাই এসেছে উপরে, যত সব নিষিদ্ধ বিষয় অবহেলিত বিষয় তাদেরই স্থান সর্বোচ্চে। আমাদের সাহিত্যে সেই

ভূমিকম্পের বেগ কিছু দেরীতে পৌঁছেছে বলেই যাঁরা ঘর দ্বার নিয়ে সুখে ঘুমিয়ে ছিলেন তাঁরা সাহিত্যরাজ্যে অন্ধকার দেখছেন, শান্ত প্রবাহের অগ্রদূতদের ভাবছেন অপরূপ বিভীষিকা। কিন্তু কিছু কাল থেকে ইউরোপে যা চলে আসছে এখন থেকে আমাদের দেশেও তাই চলবে, আমাদেরও হাটে বিকবে, আমাদেরও সাহিত্য হবে হাটের সাহিত্য। সময় সময় বোঝা শক্ত হবে, এ জিনিষ সাহিত্য না সমাজতত্ত্ব না অর্থ-নীতি না যৌননীতি। এবং পদে পদে মনে হতে থাকবে এ জিনিষ খাঁটি স্বদেশী, না রাশিয়া-নরওয়ের আমদানী।

তৃতীয়ত আমরা যে আমাদের পূর্ববর্তীদের তুলনায় কামুক বা দুর্মুখ বা বেহায়া এ অভিযোগ সত্য নয়। আমাদের অপরাধ, আমাদের পূর্ববর্তীরা যে ক্ষেত্রে চোখ বুজে ছিলেন আমরা সে ক্ষেত্রে চোখ খোলা রেখেছি। কালিদাসের কালে দুর্ভিক্ষ মহামারী দাস-ব্যবসায় বেশ্যাবৃত্তি ইত্যাদি সমস্তই ছিল, কিন্তু তাঁরা সামান্যই দেখেছিলেন, সামান্যই কেঁদেছিলেন। সামান্যই cynical হয়েছিলেন। আমরা এত পাপ দেখছি যে মাথা ঠিক রাখতে পারছিনে, কলম সামলাতে পারছিনে, চোখে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছি, নিজেরা পাথর হয়ে গিয়ে অন্যদের পাথর করে তুলছি।

পাঠকের সুস্থ রুচিবুদ্ধির প্রতি আবেদন আমরা করিনে, কেননা আমাদের নিজেদেরই রুচিবুদ্ধির সুস্থতা নষ্ট হয়ে গেছে। ঘা খেয়ে খেয়ে আমাদের হৃদয় হয়ে গেছে ভোঁতা। আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্যের স্থলে স্থলে যে সৌকুমার্য দেখি সে যেন যক্ষ্মারোগের, তার সঙ্গে এ জগতের নাড়ীর বাঁধন নেই; Yeats, Maeterlinck যেন সুতো ছেঁড়া ফানুস। রবীন্দ্রনাথের মতো মাটির উপর শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আকাশে চোখ মেলে দিয়ে অসীমকে দেখা অন্য কোনো লেখকের মধ্যে দেখিনে, এক ছিলেন Browning, কিন্তু তাঁর

মধ্যেও সত্যে মিথ্যায় তুমুল সংঘর্ষ। Tolstoyএর মধ্যেও স্থৈর্য ছিল না।

কতকাল এই অস্থিরতার যুগ চলবে জানিনে। জীবন অস্থির হ'লে সাহিত্যও অস্থির হয়। জীবনের অস্থিরতা বৃদ্ধিই পাচ্ছে—একটার পর একটা উদ্ভাবন মানুষকে পৃথিবী ছাড়িয়ে মঙ্গলগ্রহে নিয়ে যেতে চল্ল। তখন হয়তো সৌরজগতের দুঃখে আমরা পাগল হয়ে যাবো। যাঁরা ভাবছেন, ভাবী সাহিত্যে প্রাচীন সাহিত্যের প্রশান্তি ফিরে আসবে, সব ঠিক হয়ে যাবে, বর্তমান সাহিত্য একটা দুঃস্বপ্নে পর্যবসিত হবে তাঁদের সঙ্গে আমি একমত হ'তে পারছিনে।

খুব সম্ভব এই হবে যে আমরা স্থিতির বদলে গতিটাকেই জগতের নিয়ম বলে মেনে নেবো। বেগের মধ্যে একপ্রকার স্থৈর্য অনুভব করবো। গতি সত্ত্বেও সমাহিতচিত্ত হতে শিখবো—আমাদের ভাবী সাহিত্য গতির সাহিত্য হয়েও রাজপুরীর সাহিত্যই হবে, একটা ভিত্তিহীন মায়াপুরীর আকাশ-কুসুম হবে না। জীবনের জটিলতা জ্যামিতিকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে; বিজ্ঞান দর্শন রাজনীতি ও সমাজনীতি সকলেই যে সাহিত্যের স্রোতোবেগে ঘূর্ণী সৃষ্টি করতে করতে চলবে। সমস্যার সমাধানে সাহিত্যকে দোলা করে দুলতে থাকবে। এই আমার ধারণা। Rollandএর John Christopher যাঁরা পড়েছেন তাঁরা ভাবী সাহিত্য সম্বন্ধে আশাবান হতে পারেন। সে সাহিত্য প্রেত প্রমথ দৈত্যদানার সাহিত্য হবে না। মানুষেরই সাহিত্য হবে, কিন্তু সে মানুষ অস্থির মানুষ, অশান্ত মানুষ।

১৯২৮

সঙ্কট ও সাহিত্য

বিশুর পরম হিতৈষী এক বয়ঃপ্রাচীন সাহিত্যিক তাকে উপদেশ দিয়েছিলেন বেশী না লিখতে। তাঁর উপদেশের পূর্ব হতেই সে ঐ উপদেশ পালন করে আসছে। বেশী লেখা দূরে থাক, আদৌ কেন লিখবে এমন কথাও তার মনে উদয় হয়। ঘরে বাইরে আজ ঘটনার ঘনঘটা, জীবনমরণ সমস্যা। কিন্তু মাঝে মাঝে বিচলিত হয়ে ভাবে, জগতের ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে দেশের ইতিহাসের এই সঙ্কটমুহূর্তে নির্জলা সাহিত্যরচনার জন্যে লেখনী যারা ধরে তারা পলাতক, তারা কাপুরুষ। যারা আহ্বানের শব্দ শুনেছে তারা কী করে ঘরে থাকবে, কী করতে লেখনী নিয়ে খেলা করবে! যাদের রক্তে দোলন লেগেছে তারা দোলনায় শুয়ে স্বপ্ন দেখবে না, তারা লাগাম হাতে নিয়ে ঘোড়-সওয়ার হবে। ইতিহাসের এই পর্ব যখন অতীত হবে তখন যদি তারা জীবিত থাকে তবে আবার তুলে নেবে লেখনী, আবার আসবে সাহিত্যের সময়। এখন কি সাহিত্যের সময়!

তার পরে ভাবে, সব সময়ই সাহিত্যের সময়, সৃজনের সময়। মড়কের দিনে কি প্রজনন বন্ধ থাকে? প্রলয়ের দিনে কি প্রকৃতি নব সৃষ্টির বীজ বপন করে না? সাহিত্যের ইতিহাসে দেখা গেছে চার দিকে যখন মরণের বিভীষিকা, অনাচার, অত্যাচার তখন সেই ঘাত-প্রতিঘাত অগ্রাহ্য করে সাহিত্যের কুঞ্জে বসন্ত আসে। পারিপার্শ্বিক প্রতিকূল হলে জীবন বিপন্ন হতে পারে, কিন্তু ঋতুবিপর্যয় ঘটে না, বরং ঋতুলীলা আরো নিবিড় হয়। যারা প্রকৃত কবি তারা প্রকৃতিধর্মী, তারা প্রকৃতিরই মতো লীলারত। না, কোনো সময়েই লেখনী ছেড়ে লাগাম

ধরা যায় না। তবে কেউ কেউ সব্যসাচী। এক হাতে লেখনী ধরেন, অন্য হাতে লাগাম। ইতিহাসে তার নজির রয়েছে।

কিন্তু দুইয়ের মাঝামাঝি অবস্থা কিছুর পছন্দ হয় না। লেখনীটাকেই লাগাম করে কাগজের ঘোড়া ছুটিয়ে সংগ্রাম যেন ছেলেদের যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলা। এতে প্রাণবানের মন তৃপ্তি পায় না, সার হয় আত্মপ্রতারণা। যদিও আধুনিক ইউরোপে এর ভূরি ভূরি উদাহরণ তথাপি কিছু এসব ভূমিকাধারীদের শ্রদ্ধা করতে পারে না। এঁরা ধরতে চান বল্লম, কিন্তু সে সাহস নেই, শক্তিরও অভাব। তাই কলমকে বানাতে চান বল্লম। এটা কলমের প্রতি অন্যায়, বল্লমের প্রতি অবিচার। লেখনীর প্রতি যাঁদের মমতা নেই, যাঁরা তাকে ব্যবহার করতে চান ক্ষেপণী রূপে, তাঁদের বিচারবিভ্রাট ফলে তাঁদের লেখা সাহিত্য হিসাবে নিম্ন।

যাঁরা বল্লম না ধরলে তুষ্ট হবেন না তাঁদের কলম ছাড়তেই হবে, যাঁরা কলম ছাড়তে অনিচ্ছুক তাঁদের বল্লম ধরবার উপায় নেই। সব্যসাচী অবশ্য ব্যতিক্রম। যাঁরা সব কাজে হাত লাগান তাঁরা সব কাজে নাম করতে পারেন, ইতিহাসে তার নজির মেলে। কিন্তু যাঁরা একটি কাজের কাজী তাঁদের সমকক্ষ হতে চাইলে তাঁদেরই মতো একনিষ্ঠ হতে হয়। কলালক্ষ্মী ধরা দেন একনিষ্ঠ আরাধনায় তুষ্ট হলে। রণচণ্ডীরও সেই স্বভাব।

তা হলেও, শিল্পীকে যদি বেছে নিতে বলা হয় শিল্পী হয়ত অ্যাকশনকেই বরণ করবে আজ। কারণ এত বড় একটা ব্যাপারে যোগ না দিলে জীবনের সঙ্গে যোগ থাকে কি? জীবনের সঙ্গে যার যোগ নেই সে যোগী হতে পারে, কিন্তু সাহিত্যিক হবে কি?

অবশ্য যোগ যদি জোর তবে লেখা বন্ধ রাখতে হবে। বেশি লেখা দূরে থাক, আদৌ লেখা হয়ে উঠবে না। শিল্পী তো সব্যসাচী নয়, সব্যসাচী হলে কোনো প্রশ্ন উঠত না, সব্যসাচীদের কাছে এই সঙ্কট

উভয়সঙ্কট নয়। শিল্প কিন্তু উভয়সঙ্কটে আবদ্ধ। তাই তার পক্ষে বেছে নেওয়া শক্ত। যদি অ্যাকশন বেছে নেয় তবে ধ্যান করবার অবসর পাবে না, ধ্যান না করে লিখলে সে লেখা সাহিত্যের রত্নমঞ্জুষায় স্থান পাবে না। শ্রেষ্ঠীরা তাকে বাজিয়ে দেখবে, সে লেখা থাকবে না, সুতরাং বাজে।

আর যদি ধ্যান বেছে নেয় তবে এই ঐতিহাসিক গোধূলি লগ্নে, এই দুঃসময়ে, লক্ষ লক্ষ নরনারীর শোভাযাত্রায় কি থাকবে অনুপস্থিত। এত বড় একটা ব্যাপারে অনুপস্থিত থাকা কি বাঁচা! সে তো বেঁচে মরা। শিল্পীর পক্ষে তেমন করে বেঁচে থাকা যে অন্যায়।

ক্রিমিয়ার সমরে অংশ না নিলে কি টলস্টয় পরে "War and Peace" লিখতে পারতেন? আমেরিকার গৃহযুদ্ধে যুক্ত না থাকলে কি হুইটম্যান লিখতে পারতেন অত উৎকৃষ্ট কবিতা ও "Democratic Vistas"? এই দুটি দৃষ্টান্তই যথেষ্ট।

অপর পক্ষে গ্যয়টের কথা মনে আসে। জার্মানী যখন নেপোলিয়নের পদানত তখন তিনি তাঁর শান্তির ধ্যান থেকে নড়েননি, তাতে পূর্বের ন্যায় মগ্ন। আর ভিয়েনায় যখন গোলা পড়ছে বেটোফেন তখন পিয়ানো বাজিয়ে চলেছেন, ভ্রূক্ষেপ নেই কী হচ্ছে। তিনি অবশ্য কানে শুনতে পেতেন না। শুনতে পেলেও কি শুনতেন? শিল্পীর ধ্যানভঙ্গ করতে ইন্দ্র যেসব অপ্সরা পাঠান ঘটনা তাদের অন্যতম নয়। ঘটনাকে তাঁরা উপেক্ষা করেন।

২

এই সব দৃষ্টান্তের দ্বারা এই প্রমাণ হয় যে কারো কাছে বাইরের জীবন বড়, কারো কাছে অন্তরের জীবন। কেউ নিমন্ত্রণে যোগ দিতে

না পারলে ভাবেন জীবন ব্যর্থ। কেউ স্বেচ্ছায় অনুপস্থিত থাকেন, ভাবেন, ওটা একটা অনাবশ্যক ব্যাঘাত। কেউ স্বভাবত সামাজিক, সকলের সঙ্গে মিশতে ভালোবাসেন। কেউ স্বভাবত অসামাজিক, মিশতে জানেন না ও চান্ না। সেইজন্যে সব শিল্পীর বেলায় একই নিয়ম খাটে না। কার বেলায় কোন নিয়ম খাটে তা বোঝেন তাঁরা নিজেরাই। কেউ তাঁরাও বোঝেন না, না বুঝে মেনে যান অদৃশ্য অনুশাসন।

অ্যাকশনকে যাঁরা একটা উৎপাত মনে করেন তাঁরা ওর থেকে শত হস্ত দূরে থাকলে সুখী হন। এর মানে এ নয় যে তাঁরা প্রাণের ভয়ে পলাতক, তাঁরা কাপুরুষ। এর মানে তাঁরা তাঁদের সমস্ত শক্তি সংহত করতে চান সৃজনের জন্যে। অপরে ভুল বুঝবে বলে তাঁরা চিন্তিত নন, তাঁদের বিশ্বাস একদিন সকলে ঠিক বুঝবে। গ্যেটে বলেছিলেন তাঁর মৃত্যুর দিন কয়েক পূর্বে একারমানকে—

"Hard as I have toiled all my life, all my labours are as nothing in the eyes of certain people, just because I have disdained to mingle in political parties. To please such people I must have become a member of a Jacobin club, and preached bloodshed and murder....Mind, the politician will devour the poet."

অথচ গ্যেটে একজন রাজমন্ত্রী ছিলেন, রাজার সঙ্গে অর্থাৎ ভাইমারের ডিউকের সঙ্গে যুদ্ধযাত্রায় গিয়েছিলেন। অ্যাকশন দেখে ভয় পাবার পাত্র ছিলেন না তিনি। ভয় নয়, বিরাগ তাঁকে নিবৃত্ত করেছিল।

এ যেমন এক পক্ষের কথা তেমনি অপর পক্ষের কথা রম্যাঁ রলাঁর ভাষায়—

"Action is the end of thought. All thought which does not look towards action is an abortion and a treachery. If then we are the servants of thought we must be the servants of action."

গত মহাযুদ্ধের সময় রলাঁ লেখনী ছেড়ে ক্ষেপণী ধরেননি, কিন্তু লেখনী দিয়ে যা করেছিলেন তা নির্জলা সাহিত্য সৃষ্টি নয়, আহত ও নিহতদের আত্মীয় আত্মীয়াদের চিঠি লিখে শক্তি ও সান্ত্বনা দিয়েছিলেন। তাতে তাঁর প্রায় সমস্ত সময় অতিবাহিত হয়েছিল। [illegible] দিক থেকে এটা একটা অপচয়, সাহিত্যিকের [illegible] ছিলেন। কিন্তু রলাঁ তো শান্তিতে বসে বই লেখবার মানুষ নন।

উভয় পক্ষের বক্তব্য প্রণিধান করে কিন্তু এই মীমাংসায় উপনীত হয়েছি যে লেখকেরা সৈনিক বাধ্যতা সইতে পারেন না বলে রণাঙ্গনের নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন, তাঁরা সৈনিক বাধ্যতা সইতে রাজী যদি রণাঙ্গনের নিমন্ত্রণ পান; আসলে এটা সহিষ্ণুতার প্রশ্ন, বাধ্যতা-সহিষ্ণুতার।

এ দিক থেকে ভেবে দেখলে কিছু মনঃস্থির করতে অক্ষম হই। কেননা রণাঙ্গনের নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করা হয় না কষ্টকর তা দিনের পর দিন মাসের পর মাস বছরের পর বছর বহন করা যথোচিত কষ্টকর। রণাঙ্গন যদি স্বল্পকালীন হতো তা হলে অত বিতর্ক শোনা যেত না, কিন্তু কেউ জোর করে বলতে পারে না বর্তমান সঙ্কট কতকাল স্থায়ী হবে। সৈনিক রণাঙ্গনের জন্যে তালিম হয়েছে, পাঁচ বছর তার কাছে কিছু নয়। কিন্তু শিল্পী তত দিন অশিল্পী হলে অস্বস্তি বোধ করে। এ যেন শেয়ালের বাড়ী বকের নেমন্তন্ন। কী করে খেতে, মুখ লাগাতে পারে না। শেয়ালের রণাঙ্গন ভূরিভোজন, বকের রণাঙ্গন ভোজ্যবর্জন।

শেষপর্যন্ত রণাঙ্গনে উপস্থিত থাকার অর্থ ঘটনার সাক্ষী থাকা ও পরে সাক্ষ্য দেওয়া। সাহিত্যিকের সাক্ষ্য সাহিত্য। সুতরাং রণাঙ্গনের পরিণতি কাব্যই। গত যুদ্ধে যে সব সাহিত্যিক যোগদান করেছিলেন তাঁরা সৈনিক হিসাবে কে কেমন কৃতী হয়েছিলেন জানা নেই, কিন্তু ফিরে এসে জবানবন্দী লিখেছিলেন অনেকে।

৩

যাই হোক এটা স্থির যে দ্বিচারিতা শিল্পের জন্যে নয়। কিন্তু বলে, একই মানুষ সাহিত্যিকও হতে পারে, সৈনিকও হতে পারে। এমন কি একই সঙ্গে দুই হতে পারে। কিন্তু যে মুহূর্তে লেখনী নিয়ে খেলা করবে সে মুহূর্তে সঙ্গীন ভূতলে রাখবে এবং কবিত্বের রঙে রঙীন হবে। কাব্যের নিয়ম মানলে তবেই সে প্রয়াস হবে কাব্যকলাপ, নতুবা সৈনিকের প্রলাপ। একই মানুষ দুই হতে পারে, কিন্তু একই জিনিস দুই হতে পারে না। সৃজন ও সংহরণ দুই স্বতন্ত্র ব্যাপার। সাহিত্য ও সমর দুই স্বতন্ত্র বস্তু।

সৈনিক সম্বন্ধে যা বক্তব্য শ্রমিক সম্বন্ধেও তাই। একই মানুষ সাহিত্যিকও হতে পারে, শ্রমিকও হতে পারে। এমন কি একই সঙ্গে দুই হতে পারে। কিন্তু যে মুহূর্তে লেখনী হাতে নেবে সে মুহূর্তে হাতুড়ি হাত থেকে নামাবে আর কবিত্বের আবেগে তুড়ি দেবে। কাব্যের কলাবিধি মেনে চললে তবেই তার সেই প্রয়াস কাব্যকলাপ, অন্যথা শ্রমিকের বিলাপ।

মোট কথা, তাল ঠুকে কিছু লিখলেই তা সাহিত্য হয় না। সাহিত্যের তালজ্ঞান থাকা চাই। তালজ্ঞান না থাকলে প্রাণে হাজার আবেগ থাকলেও সেই আবেগের উদ্গার সাহিত্য হবে না, শুধু ভালোমানুষের মনে উদ্বেগ সঞ্চার করবে, ছেলেমানুষের মনে উন্মাদনা। সাহিত্য একটা আর্ট। আর্টের জন্যে কী পরিমাণ খাটতে হয় তা ভাস্কর্যের দিকে তাকালে প্রত্যক্ষ হয়। কিংবা সঙ্গীতের দিকে। সেইজন্যে খুব কম লোকের পক্ষেই সব্যসাচী হওয়া সম্ভব। যে দু'এক জনকে হতে দেখা যায় তাঁরা ডবল খাটেন। শিল্পের জন্যে এক দফা, সমাজের জন্যে আরেক দফা।

তবে সাধারণের অবচেতনায় কেমন যেন একটা সংস্কার নিহিত রয়েছে যে সাহিত্য তেমন কিছু কঠিন কাজ নয়, কোনো মতে কাগজের উপর কলমের আঁচড় টানলেই তার নাম সাহিত্য। রসসাহিত্য বলে একটা কথা মাঝে মাঝে শোনা যায়। যেন নীরস সাহিত্য বলে অন্য কিছু আছে! যাতে রস নেই তা সাহিত্য নয়, আর রসের সাধনা বড় দুরূহ সাধনা। এতে ধৈর্য না হলে সিদ্ধি নেই, তাই সাফল্যের নিমন্ত্রণ রক্ষা করা দুষ্কর। অথচ নিমন্ত্রণ তো প্রতিদিন জোটে না, জীবনে হয়ত একবার সে সুযোগ আসে।

এমনি সাত পাঁচ ভাবে কিন্তু। বেশী লেখা দূরে থাক, আদৌ লিখবে কি না তোলপাড় করে। কেন লিখব? এই তার প্রথম প্রশ্ন। এর উত্তর যদি মেলে তবে দ্বিতীয় প্রশ্ন ওঠে, কেমন করে লিখব? এর নিরসন হলে তৃতীয় প্রশ্ন, কী লিখব?

কেন লিখব? এর উত্তর, না লিখে সোয়াস্তি নেই। মনে যা জমছে তা আপনি উপচে উঠেছে, ফোয়ারার মতো ছুটছে। সম্পাদক যদি না ছাপেন প্রকাশককে দেব, প্রকাশক যদি না ছাপেন হাতে লিখে ছড়াব, কেউ যদি না পড়ে মাটিতে পুঁতে রাখব। নিজের ভার হালকা হলেই আমি খুশি। সর্বজনকল্যাণের জন্যে মাথা নেই। যাতে সত্য আছে, সুন্দর আছে, তাতে শিবও আছেন। আমার লেখা যদি মাটিতেই পোঁতা থাকে তবু সমাজ তাকে এক দিন খুঁজে বার করবে ও তাতে যদি খোঁচা থাকে তবু তার আস্বাদ নেবে। কেন লিখব? এর উত্তর, লেখার জন্যেই লিখব। আর্ট ফর আর্টস্ সেক।

তারপর, কেমন করে লিখব? এই প্রশ্নটি সব চেয়ে শক্ত। একই কথা একশো ধরনে বলা যায়। তার মধ্যে কোন ধরণটিতে স্বাদ আছে, ব্যঞ্জনা আছে, মাধুর্য আছে? আর আছে বৈশিষ্ট্য? লেখকের জীবনে এটি হলো প্রতি দিনের প্রতি ক্ষণের প্রশ্ন। পরে পরে এই

ঘষে মেজে দেয়, বিচার করে। লেখক একটু আগে যা লেখেন একটু পরে তা কাটেন। বস্তুত এই দ্বিতীয় প্রশ্নটির কে কিরূপ উত্তর দেন তার দ্বারা নির্ণীত হয় তিনি শিল্পী না অন্য কিছু। লেখক অনেক, রসিক অনেকতর। কলালক্ষ্মী এই সাধনাটি সাধতে দিয়ে কলাবিদ্ মনোনয়ন করেন। যাঁরা ফাঁকি দিতে চান তাঁরা রকমারি বুলি দিয়ে ভোলান, ভঙ্গী বিস্তার করেন। তাতে ফাঁকির ফাঁক ভরে না। ঠেকতে হয় একদিন। এমনো দেখা যায় যাঁরা অজস্র লিখেছেন তাঁরাও মনোনয়ন পাননি, বরমাল্য পেয়েছেন যাঁরা অল্প কয়েকটি মনের মতো লেখা লিখেছেন। অল্প কথায়, রসোত্তীর্ণ হতে হবে।

তৃতীয় প্রশ্ন, কী লিখব? বিষয়ের লেখাজোখা নেই। যে কোনো বিষয়ে লেখা যায়। জীবনমরণ সমস্যা নিয়ে লিখলেও সকলের হাতে সাহিত্য হয় না, আবার কাঁচকলা ও কৈ মাছ নিয়ে লিখলেও কারো কারো হাতে চারুকলা হয়। সরস্বতীর শুচিবাতিক নেই, তিনি একান্ত উদার। আমিষ নিরামিষ যে যা উপচার দেয় তিনি নির্বিকারে গ্রহণ করেন। কিন্তু নির্বিচারে সেবন করেন না। এ স্থলে আন্দোলনের কথা ওঠে। সাহিত্যের আন্দোলন সাহিত্যের ঘরোয়া ব্যাপার। সমাজ এতে হস্তক্ষেপ করলে সমাজের ইষ্ট কী হয় সমাজই জানে, কিন্তু সাহিত্যের হয় অনিষ্ট। সমাজের সঙ্গে সাহিত্যের যদিও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তবু তারা যেন দুই প্রতিবেশী রাজ্য, কেউ কারো করদ নয়, উভয়ে উভয়ের মিত্র। সাহিত্য যখনি সমাজের সঙ্গ সম্পর্ক কাটিয়েছে তখনি আপনাকে আপনি একঘরে করেছে। পক্ষান্তরে যখনি সমাজের তরফ থেকে হুকুম জারি হয়েছে তখনি সাহিত্যের অমর্যাদা ঘটেছে। এই দাবী যে কেবল বাইরে থেকে আসে তা নয়। সাহিত্যিকরাও সামাজিক মানুষ। তাঁদের নিজেদের ভিতর থেকে সামাজিক মনের দাবী উত্থিত হয়। তাঁদের সামাজিক মন তাঁদের হাত

জোর করে এমন সব কথা লেখায় যা সাহিত্যের প্রাণের কথা নয়, যা সামাজিক প্রয়োজনের কথা। অথবা তাঁদের এমন সব কথা লিখতে দেয় না, যা সাহিত্যের প্রাণের কথা হলেও সমাজের প্রাণঘাতী কথা। উপায় নাই। বাইরের সমাজকে অমান্য করা দুঃসাধ্য হলেও অসাধ্য নয়। ভিতরের সমাজ যখন আগুন হয় তখন সাহিত্যিকের লেখনী হয় লেখনী, তাঁর কলমের ধার হয় ছুরির চেয়ে তীক্ষ্ণ, হুলের চেয়ে তীব্র।

শাসকদের শাসনটা প্রকৃত পক্ষে ভিতরের সমাজেরই শাসন। বাইরের সমাজেরও অবদান। নির্ভীক লেখকদের কাজ কিছু দিনের জন্যে বন্ধ রাখলেও ক্ষতি নেই, ক্ষতি আছে কী লিখব তা যদি শাসকদের দ্বারা নির্ধারিত হয়। কেমন করে লিখব, তাও শাসিত হয় যদি শাসকদের ঘোড়ায় চড়ে লিখি। তার চেয়ে আদৌ না লেখা ভালো।

১৯৪১-৪২

রবীন্দ্রনাথ ও মুসলমান

রবীন্দ্রনাথের জীবনাবসানের কিছুদিন পূর্বে আমাদের একজন মনীষী আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—রবীন্দ্রনাথ তাঁর সারা জীবন মুসলমানদের সঙ্গে কাটিয়েও তাদের ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি ও সভ্যতা সম্বন্ধে কতটুকু জানতে চেষ্টা করেছেন? যিনি কম্যুনাল এওয়ার্ডের প্রতিবাদসভায় নেতৃত্ব করতে পারেন তিনি কৃষকপ্রজার জন্যে যা লিখেছেন বা করেছেন তার চেয়ে বেশী করতে পারতেন না কি?

আমি এর উত্তর দিইনি। দিতে পারতেন কবি স্বয়ং, কিন্তু তখন তাঁর উত্তর দেবার সময় উত্তীর্ণপ্রায়। তখন থেকে এই জিজ্ঞাসা আমার মনে ঘুরছে, যদিও জানি যে কবি চিরকালের মতো নিরুত্তর। সেক্স্‌পীয়ারকে স্মরণ করে লিখেছিলেন ম্যাথ্যু আর্নল্ড,—

"Others abide our question.
Thou art free.
We ask and ask :
Thou smilest and art still,
Out-topping knowledge..."

যে রবীন্দ্রনাথ হিন্দু জমিদার ছিলেন তিনি আর নেই, এখন যিনি আছেন তিনি জগতের জন দশেক কালজয়ী মহাকবির একজন। মহাকালের নবরত্নের সভায় দশম রত্ন। যতই দিন, মাস, বছর যাবে, যুগ যাবে, শতাব্দী যাবে ততই ঝরে পড়বে তাঁর জীবনের এক একটি জীর্ণ পত্র, এক একটি অবান্তর পরিচয়—তাঁর হিন্দুত্ব, তাঁর বাঙালীত্ব, তাঁর ভারতীয়ত্ব, তাঁর আভিজাত্য। থাকবে কয়েকটি কবিতা ও গল্প, আর থাকবে রাশি রাশি গান। বসন্তে বর্ষায় শরতে সেই সব গান কণ্ঠে

কণ্ঠে কূজিত হবে। বিরহে মিলনে ত্যাগে, জীবনের যাবতীয় উপলব্ধিতে, জীবনান্তের শোকে সেই সব শান্ত হৃদয়ের ভার লাঘব করবে।

তখনকার দিনে এ প্রকার জিজ্ঞাসা জাগবে না। কিন্তু এখনকার দিনেতো জেগেছে, অন্ততঃ একজনের মনীষায়। এ দেশে মুসলমান গুরুর হিন্দু শিষ্য, হিন্দু গুরুর মুসলমান শিষ্য হামেশা দেখা যায়। আমরা কি আশা করতে পারিনে যে রবীন্দ্রনাথের কোনো মুসলমান শিষ্য এই জিজ্ঞাসার উত্তর দিয়ে যোগাযোগতার সাহায্য করবেন?

পৃথিবীতে কেন, ভারতে—ভারতে কেন, বাংলাদেশে—এত কিছু জানবার আছে যে একজন মানুষ তাঁর আশীবছরব্যাপী জীবনেও অতি সামান্য জানতে পারেন। সেই যৎসামান্য জ্ঞান লেখনীমুখে জাহির করতে যাওয়া অর্বাচীনের পক্ষে অনিন্দ্য হতে পারে, কিন্তু বিবেচক ব্যক্তির পক্ষে নীরবতার চেয়েও নিন্দনীয়। আমার এক বন্ধুকে আমি একবার প্রশ্ন করেছিলুম, "আচ্ছা, তুমি ওই সব রাজা কিংবা ইঙ্গবঙ্গের কাহিনী লেখ কেন? দেশে কি আর নায়ক নায়িকা নেই?" তিনি জবাব দিয়েছিলেন, "আমি যাদের চিনি তাদের কথা নির্ভয়ে লিখতে পারি, যাদের তেমন চিনিনে তাদের কথা লিখতে সাহস হয় না।" পরে আমিও অনুভব করেছি যে লেখকের পক্ষে তার চেনা লোকদের কথা লেখাই নিরাপদ। যাদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ কম, যাদের কথা আমার শোনা কথা, তাদের কথা বুক ফুলিয়ে লিখতে গেলে এমন কৌতুক ঘটবে যে একালের বন্ধুরা আমাকে সাধুবাদ দিলেও ভাবীকালের সমালোচকরা আমাকে একেবারে বাদ দেবেন। শরৎবাবু একবার পণ করেছিলেন যে মুসলমানদের নিয়ে একখানা উপন্যাস লিখবেন। লিখলে নিশ্চয়ই একদল পাঠক তাঁকে বাহবা

দিয়েছেন, কেননা এই হিন্দু মুসলিম মনোমালিন্যের দিনে শরৎবাবুর মত উভয় সম্প্রদায়ের আস্থাভাজন সাহিত্যরথীর শব্দভেদী বাণের প্রয়োজন ছিল ও আছে। কিন্তু সাহিত্য তো সমাজসেবা নয়। সাহিত্যের নিয়ম, যা নিয়ে রসসৃষ্টি করতে পারো তাই লিখো। জেন অস্টেনের নভেল ইংরাজী সাহিত্যের গৌরব, কিন্তু চিনতেন তিনি উপরের দিকের মুষ্টিমেয় নরনারীকে। একটি সংকীর্ণ সীমার মধ্যে তাদের জীবনযাত্রা নিবদ্ধ। ইচ্ছা করলে তিনি যে বৃহত্তর সমাজের কথা লিখতে পারতেন না তা নয়, কিন্তু সে ইচ্ছা অপূর্ণ থাকাই শ্রেয়। হাজার জানলেও লিখতে নেই, যদি সে জানা সুনিশ্চিত না হয়। রবীন্দ্রনাথ মুসলমানদের সঙ্গে সারা জীবন কাটিয়ে হয়তো তাঁদের সম্বন্ধে অনেক কথাই জানতেন, কিন্তু কোনও বড় লেখকই নিজের স্বাভাবিক সীমার বাইরে পদক্ষেপ করে ভাবীকালের কাছে উপহাস্য হতে চান না। তাতে উপস্থিত কিছু হাততালি মিলতে পারে, কিন্তু আখেরে উপেক্ষা।

যে প্রশ্ন রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে উঠেছে সে প্রশ্ন একে একে আরও অনেকের সম্বন্ধেও উঠবে। আমাকে যদি জবাবদিহি করতে হয় আমি নিবেদন করব, যে পথে আমি নির্ভয়ে রথ চালাতে পারিনে সে পথ আমার নয়। মুসলমানদের সঙ্গে আমার আশৈশব পরিচয়, তাঁদের দোষগুণ দু-ই দেখেছি, কিন্তু দু-ই দেখাতে পারিনে, কারণ দেশের অবস্থা এমন যে এখানে সব জিনিষেরই বিকৃত অর্থ করা হয় এবং তার থেকে আসে অনর্থ। তাছাড়া পরিচয়ের সীমানা আরো ব্যাপক ও আত্মীয়তার অনুভূতি আরো প্রগাঢ় না হলে যেটুকু জানি সেটুকু নিজের মনে চেপে রাখাই শ্রেয়, ছেপে ছড়ানো অসমীচীন। আমরা যতদিন না পরস্পরের সুখে দুঃখে আপনার হতে পেরেছি, যতদিন আমাদের এক পক্ষের দুঃখে অপর পক্ষ সুখী ও এক পক্ষের সুখে অপর পক্ষ দুঃখী, যতদিন একই দেহের দু'খানা হাত একটা আর একটার আঙুল

কাটবে—ততদিন আমরা যে যার সীমার ভিতরে থেকে যথাসাধ্য রস সৃষ্টি করব। পরবর্তীকাল জিজ্ঞাসা করবে না, এ রস হিন্দু রস না মুসলিম রস; যেমন জিজ্ঞাসা করে না, এ আনারস হিন্দু আনারস না মুসলিম আনারস।

১৯৪১

কানাই ও বলাই

সাহিত্যিকদের মোটামুটি দু'ভাগ করা যায়। এক ভাগে হিতকারী, অপর ভাগে মনোহারী। এক দলের নাম দেওয়া যাক বলাই, আরেক দলের নাম কানাই।

কানাইদের বিরুদ্ধে বলাইদের নালিশ এ যুগের নয়। হলধরেরা বাঁশীধরদের বিরুদ্ধে যুগে যুগে এই কথাই বলে আসছেন যে, ওরা কাজ করে না, খেলা করে। শেখায় না, ভোলায়। রোম যখন পোড়ে তখনো ওরা বাঁশী বাজায়। ওদের কাছে আগুন নেবানো তুচ্ছ, আগুন পোহানোই আসল।

বলরামের হলখানির ওজনটি তো কম নয়। ওখানি ঘাড়ে করে বেড়ালে ঘাম ঝরবেই। কর্মের লক্ষণ হলো ঘর্ম। বলাইদের মতো কাজের লোক কানাইদের মতো বাজে লোকদের সহ্য করতে পারেন না। বাঁশীর আর কত ওজন। এ তো ছেলেখেলা।

কিন্তু রাগটা কানুর উপরে না করে বেণুর উপরেই করা উচিত। ওজন হিসাবে হলের ওজন বেণুর চেয়ে বেশী। সুতরাং মূল্য হিসাবে হলের মূল্য বেণুর চেয়ে বেশী। অথচ বেণুর ধ্বনি গগনভেদী হৃদয়ভেদী।

একদল লেখকের হাতে লেখনী যেন লাঙল। তাঁরা যে লাঙলের গুণগান করবেন সেটা স্বাভাবিক। আরেক দলের হাতে সেই জিনিসটি যেন বাঁশরি। তাঁরা যে তাই নিয়ে বিভোর থাকবেন এটাও স্বাভাবিক। লেখনী দেখতে একই রকম, সেইজন্যে সকলেই লেখক। কিন্তু লেখা যখন বেরোয় তখন দেখা যায় কোনোটা হলকর্ষণ, কোনোটা

কর্ষণ। বলরামেরা নিজেদের কীর্তি দেখে তৃপ্তিবোধ করতে পারেন না, পরের ছিদ্র ধরেন। বাঁশির ছিদ্র আছে, তাই ছিদ্র ধরাও সোজা।

• • • • •

বলভদ্রদের দল চিরকাল বেশী। সে দল সমাজের দল। তাঁরা বিশ্বাস করেন ও করাতে চান, সবার উপরে সমাজ সত্য, তাহার উপরে নাই। তাঁরা বলেন, সমাজের আন্দোলনই সাহিত্যের আন্দোলন। সাহিত্যের নিজস্ব আন্দোলন নেই, সাহিত্য সমাজের সামিল।

বলাইরা তাঁদের মত নিয়ে বেঁচেবর্তে থাকুন, কানাইদের তাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু কালের সঙ্গে বল পরীক্ষায় বলভদ্রদের হার হয়, তাতে তাঁদের মেজাজটা যায় বিগড়ে। সেইজন্যে তাঁরা বংশীধরদের বংশ ধ্বংস করতে পারলে ঠাণ্ডা হন। ওদের প্রধান অপরাধ ওরা পলাতক। ওরা খাটে না, খায়। ওরা ফরমাস মানে না, নিরঙ্কুশ। ওরা সমাজের সঙ্গে বেখাপ।

কিন্তু কালের সঙ্গে ওদের চমৎকার খাপ খায়। কালের স্রোত কালিন্দীর স্রোতের মতো উজান বেয়ে শ্রোতা হয় কানাইয়ের বেণুর। অসামাজিক, তবু সমাজের সুপ্রিয়।

১৯৪১ (আষাঢ়)

চিঠির কথা

চিঠি পেতে আমার এখনো ভালো লাগে, কিন্তু লিখতে?

লিখতে ভালো লাগে না বললে বাড়িয়ে বলা হয়, অথচ ভালো লাগে বলতেও বাধে। অনেক দিন থেকে শরীরে এক প্রকার ক্লান্তি বোধ করে আসছি, বোধ হয় স্নায়ুটা তার। অথবা মনের, কেননা মনেও এক প্রকার নির্লিপ্ত ভাব। এমন হুজুগ বেশী নেই যা আমাকে উসকে দিতে পারে। আর সমস্যা যা আছে তা যত সোজা ভেবেছিলুম তত নয়, সমাধান শোনাতে যাওয়া ছেলেমানুষী। এই ধরুন হিন্দু মুসলিম সমস্যা। এক কালে এর জন্যে যত রক্ত ক্ষয় করেছি তা প্রায় রক্তপাতের সমান, সে সব চিন্তা চিতার মতো আমাকেই জ্বালিয়েছে, আর আমার প্রবন্ধ পড়ে পক্ষপাতী পাঠক পাঠিকারা জানিয়েছেন, "এর চেয়ে একটা গল্প লিখলে পড়ে তৃপ্তি হতো।"

দেহমনের এই অবস্থায় চিঠি লিখতেও উৎসাহ পাইনে। অবশ্য যে চিঠি সরকারী বা দরকারী তার জবাব দিতে হবে, তার বাঁধা ভাষা আছে, লিখতে কষ্ট যেটুকু হয় সেটুকু মানসিক নয়, শারীরিক। সরকারী হলে তো কোনো কষ্টই নেই, স্টেনোগ্রাফার আছেন, তিনিই শারীরিক ক্লেশ থেকে বাঁচান।

কিন্তু যেসব চিঠি নেহাৎ অদরকারী তাদের বেলায় আমার হাতের চেয়ে মাথার ঝঞ্ঝাট বেশী। একদা আমি অকাতরে চিঠির তুলো উড়িয়েছি, এই যেমন শিমুলের তুলো উড়ছে তেমনি। তখনকার দিনে সব বিষয়েই আমার একটা তৈরি মত ছিল। আইনস্টাইন থেকে শুরু করে গ্রেটা গার্বো পর্যন্ত যে কোনো মানুষের সম্বন্ধে, ভবের সম্বন্ধে দু' কথা লিখতে

ভাত হতুম না, গায়ের জোরে তর্ক করতুম ও কলমের জোরে কাগজ কালো করতুম। ধৈর্যও ছিল অসীম, কেউ যদি না বুঝত আমি চিঠির পর চিঠি লিখে বোঝাতুম। সেসব দিন গেছে।

এখন যে আমার তর্কের ঝোঁক নেই তা নয়। মত জাহির করার রোগও আছে। সেদিন এক বন্ধুর সঙ্গে বারো বছর পরে দেখা হলো, যত ক্ষণ একত্র ছিলুম দু'জনে তুমুল বকেছি, কেউ কাউকে ভজাতে পারিনি, সেই তো দুঃখ। কিন্তু শতং বদ, মা লিখ। সেই বন্ধু যদি চিঠি লিখতেন আমার অন্য রূপ দেখতেন। কেননা এই বারো বছরে আমি যেমন লিখতে শিখেছি তেমনি না লিখতেও শিখেছি।

আমার কোনো কোনো চিঠি বন্ধুজনের নির্বন্ধে মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হবার পর থেকে আমার বিশ্বাস জন্মেছে যে চিঠিরও সাহিত্যিক মূল্য থাকতে পারে। তেমনি ভয়ও জেগেছে যে আমার যেসব চিঠি ছাপবার মতো করে লেখা নয়, ফূর্তি করে লেখা, সেসব চিঠিও একদিন ছাপার হরফে উঠতে পারে। এখন চিঠি লিখতে বসলে অমনি সতর্ক হই, পাছে এমন কিছু লিখি যা ছাপার হরফে ধরা পড়লে আমাকে শুদ্ধ ধরা পড়িয়ে দেবে। পাঠকরা ভাববেন, "কই, এঁর বই পড়ে যেমন মনে হয় চিঠি পড়ে তো তেমন হয় না!" এতদিনের সাধনায় আমার যে সাহিত্যিক রূপটি দেশের পাঠকদের চোখে পরিচিত হয়ে এসেছে একখানি চিঠি তাকে একদিনেই ধূলিসাৎ করতে পারে। অতএব শতং বদ, মা লিখ।

তারপর আরো আপদ আছে। সাহিত্য রচনার একটি উৎকর্ষমান আছে, সেই মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হবার একটা প্রয়াস আছে, সে প্রয়াস তো চিঠির বেলায় স্থগিত রাখতে পারিনে। দরকারী বা সরকারী চিঠি হলে অন্য কথা, কিন্তু যে চিঠি কেবলমাত্র পড়বার জন্যে লেখা হয়েছে তা সাহিত্যের স্বজাতি, কেননা সাহিত্যও কেবলমাত্র পড়বার জন্যে লেখা। তা হলে সাহিত্যের মান চিঠির উপরও আরোপিত হয়, চিঠিও হয়ে ওঠে

সাহিত্যে। তফাৎ শুধু এই, যে চিঠি লেখার একটা নির্দিষ্ট সময়সীমা আছে, সাহিত্যের তা নেই। অর্থাৎ প্রবন্ধ বা গল্প এক মাস পরে লিখলেও চলে, চিঠি ফেলে রাখলে চলে না। পত্রলেখকরা পত্রপাঠ উত্তর প্রত্যাশা করেন। আমি এ সমস্যার সমাধান খুঁজে পাইনে, এ সমস্যা হিন্দু মুসলিম সমস্যাকেও ছাড়িয়ে যায়। যদি আমি রবীন্দ্রনাথ হতুম তবে যাই লিখতুম তাই হতো উৎকৃষ্ট, কিন্তু আজ যা লিখি কাল তা পছন্দ হয় না। সেইজন্যে আমার চিঠি যেদিন লেখা হয় সেদিন ডাকে না গেলে পর দিন ছেঁড়া কাগজের টুকরিতে যায়। যাঁরা আমার চিঠি পান তাঁরা জানেন না যে যে ও চিঠি কোনমতে ডাকঘরে গিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছে, নয় ওর বহু জন্ম অতীত হয়েছে। তা সত্ত্বেও সে চিঠি হয়ত আমার মনের মতো হয়নি। কী করি, একেবারে জবাব না দিয়ে তো পারিনে।

ফল হয়েছে এই যে আমাকে চিঠি লিখলে আমি তিন মাস থেকে তিন বছর পর্যন্ত নিরুত্তর থাকি। এটার মূল কারণ কুঁড়েমি, কিন্তু সেই একমাত্র কারণ নয়। চিঠির যদি সাহিত্যিক মূল্য থাকে আর চিঠিতে যদি কেউ সাহিত্যের স্বাদ আশা করেন তবে তাঁকে অপেক্ষা করতেই হবে, উপায় নেই। সরকারী কাজ থাকলে জবাব লেখা সরকারের নিয়ম মেনে চলে, কিন্তু যেখানে দরকারটা কাজের নয়, ভাবের, সেখানে মনোভাবের মর্জির উপর নির্ভর করা ছাড়া গতি নেই। ভাবুকের চিঠি ভাবের অপেক্ষা রাখে, ভাব যদি তিন মাস আগে না আসে তবে ভাবের অভাব কি ভাষা দিয়ে পূরণ করা যায়? কিম্বা মামুলি কুশলসম্ভাষণ দিয়ে?

তাই আমার চিঠিতে প্রায়ই দেখা যায়, "উত্তর দিতে দেরি হলো বলে লজ্জিত।" দেরি না হলেও লজ্জার কারণ হতো, সে লজ্জা পত্রপাঠকের কাছে না হোক নিত্য কালের পাঠকের কাছে। কে জানে

কোন চিঠির দৌড় কত দূর! কোন চিঠি কবে ছাপা হবে, কার চোখে পড়বে! এমন করে লেখাই শ্রেয়: যাতে লেখার দিক থেকে ত্রুটি নেই, যা গ্রন্থের ভূমিকায় দেখা। তার জন্যে যদি তিন বছর দেরি হয়ে যায় হবে নাচার।

কিন্তু সামাজিক মানুষের লোকভয় আছে। যিনি চিঠি লিখেছেন তিনি কেন মার্জনা করবেন! তাঁর আত্মসম্মান আছে! সসীম সময়ের মধ্যে উত্তর না পেলে তিনি ধরে নেবেন যে লোকটা ভদ্রলোক নয়, চিঠি লিখলে চিঠির জবাব দেয় না। সেই ভয়ে যাহোক একটা কিছু লিখে দিতে হয়। নইলে চিঠির পাহাড় নিয়ে আমি করি কী! এই তো ইতিমধ্যে একটি স্তূপ জড় হয়েছে। একদিন বসে সবগুলির লিখব ও ছিঁড়ব, অন্ততঃ জন কয়েকের কাছে ভদ্রতা বজায় থাকবে।

লিখব, "উত্তর দিতে দেরি হলো বলে মনে কিছু করবেন না।" লিখব, "আপনার চিঠি অনেকদিন আগে পেয়েছি, কিন্তু আমার শরীর মন ভালো ছিল না।" মিথ্যা নয়। তবু সত্যও নয়। সত্য হচ্ছে এই যে শিল্পী মন সজাগ থাকে না সব দিন। যেদিন জাগে সেদিন হয়ত তিন মাস বিলম্ব হয়ে গেছে। সে মন ভদ্রলোকের মন নয়, তাই ভদ্রলোক তার জন্যে লজ্জিত।

হাঁ, চিঠি পেতে আমার এখনো ভালো লাগে, মনের সঙ্গে মনের ছোঁয়াছুঁয়ি এখনো মধুর। এমন কি, ঠোকাঠুকিও আমার মন্দ লাগে না। আমি মতান্তরকে মনান্তরে পরিণত হতে দিইনে, অতটা self-righteousness আমার সাজে না। কিন্তু চিঠি লিখতে বসলে আমি হই ভদ্রলোক, নয় ভাবুক। ধরাছোঁয়া দিতে সাহস হয় না, ফুর্তি করে লেখা বন্ধ। এর জন্যে দায়ী আমার সাহিত্যিক খ্যাতি, এ হচ্ছে খ্যাতির খেসারৎ! ছাপাখানার ভয়ে আমি আড়ষ্ট।

১৯৪১

জবাবদিহি

মানুষের মন তার শরীরের অধীন নয়, এ আমি চিরদিন মানি, চিরদিন মানব। আশী বছর বয়সেও রবীন্দ্রনাথ তরুণ ছিলেন, মনেপ্রাণে তরুণ। কিন্তু সম্প্রতি আমি আবিষ্কার করেছি যে মানুষের শরীর তার মনের অধীন নয়। মন বলছে লিখতে। লিখতে বসলুম স্ফূর্তি করে। লেখা চলল জোর কদমে। হঠাৎ দেখি শরীর অবাধ্য। ওকে বসতে বললে শুতে চায়। শুতে না দিলে এমন কাণ্ড বাধিয়ে বসে যে ডাক্তার ডাকতে হয়। ডাক্তারের কী কড়া হুকুম! শুয়ে শুয়ে চিন্তা করব তাও বারণ। হিটলার আর যাই করুক চিন্তা করতে বারণ করেনি। ডাক্তারের কী দোষ! ডাক্তারের ওয়ার্নিং তো নেচারের ওয়ার্নিং। ঝগড়া যদি করতে হয় তো প্রকৃতিদেবীর সঙ্গে।

দিব্যকর্ণে শুনতে পাই প্রকৃতি ঠাকরুণ বলছেন, তুমি কি মনে করেছ মোমবাতির দু'দিক থেকে পোড়ালেও মোমবাতি টিকবে? হয় চাকরিতে ইস্তফা দাও, নয় সাহিত্যে ইস্তফা। নয়তো অকালে দেহত্যাগ করবে বঙ্কিমচন্দ্রের মতো।

এর উত্তরে বলি, তার মানে কী দাঁড়ায় ভেবে দেখেছ, দেবী? হয় অন্ন ছাড়, নয়, অমৃত ছাড়। অন্ন যদি ছাড়ি তো প্রাণে বাঁচবো না, অমৃত ছেড়ে বেঁচে থাকতে পারি, কিন্তু তেমন করে বাঁচতে আমার স্পৃহা হয় না।

দেবী বলেন, শরৎচন্দ্র একদিন চাকরি ছেড়ে দিয়েছিলেন, জীবনে তাঁকে আর চাকরি করতে হয়নি। সাহিত্যই তাঁকে খাইয়েছে, পরিয়েছে, বাড়ী করে দিয়েছে, বাঁচিয়ে রেখেছে, অমর করেছে।

তাঁর ছিল নিজের উপর অগাধ বিশ্বাস, তোমার তা নিবে গেছে। তাই তুমি দু'বেলা চাকরি করে থাক।

আমি বলি, থাক, তুমি ওসব বুঝবে না। আমার যা দেবার আছে আমি তা দিয়ে যাবই, যেমন করে হোক। এ সংকল্প ইস্পাতের চেয়ে দৃঢ়। কিন্তু তুমি যদি দয়া না কর তো আমাকে আমার এ জন্মের কাজ অসমাপ্ত রেখে যেতে হবে, আবার জন্মাতে হবে শুধু সেই কাজটি সারা করতে। দেবী, দয়া কর।

দেবী দয়া করেন এই সর্তে যে চাকরি ও সাহিত্য ছাড়া তৃতীয় কোনো কাজে আমি হস্তক্ষেপ করব না। এতদিন কত রকম কাজে অকাজে মোড়লি ও মাতব্বরি করেছি। এই যেমন দেশ উদ্ধার, সমাজ ভাঙাগড়া, হিন্দু মুসলমানে মিতালি, কমিউনিস্ট ক্যাপিটালিস্ট সংঘাত। মোমবাতি দু'দিক থেকে পুড়ছে—পুড়বে, কিন্তু তিন দিক থেকে নয়। দু'দিক থেকেও আর বেশী দিন না পোড়ে সে কথাও ভাবছি।

এই কি আমার সব কথা? না, আরো আছে। যোগীরা চুপচাপ এক জায়গায় বসে পরমাত্মার ধ্যান করেন, সেই ভাবেই তাঁর সঙ্গে যোগস্থাপন করেন, যুক্ত হন। আমরা সাহিত্যিকরাও যোগী। কিন্তু আমাদের যোগ সকলের সঙ্গে সুখে দুঃখে একাত্ম হয়ে। সকলের মধ্যেই তিনি আছেন, তাই সকলের সঙ্গে একাত্ম হওয়াই তাঁর সঙ্গে একাত্ম হওয়া, যুক্ত হওয়া। সেইজন্যে আমি কখনো মেলামেশার সুযোগ হাতছাড়া করিনে। সম্মেলন তো মানুষের সঙ্গে মানুষের মেলন। সম্মেলনের নিমন্ত্রণ পেলে যান না কেন? যাব, যদি শরীরের বাধা না থাকে। কিন্তু বাংলার ও বাংলার বাইরে কয়েকবার নিমন্ত্রণ রক্ষা করে দেখেছি মেলামেশার সুযোগ ঘটতে গেলে ঘটে না। উদ্যোক্তারা প্রোগ্রামের মধ্যে কোথাও এতটুকু অবকাশ রাখেন না যে সাহিত্যিকদের নিয়ে ঘরোয়া ধরনের বৈঠক বসবে। দশ হাজার লোকের জনতায় দাঁড়িয়ে

মাইক্রোফোনের সাহায্যে মুখের কথা বলা যায়, কিন্তু মনের কথা বলতে হলে দশ হাজার নয় দশ বিশ জন দরদী শ্রোতা চাই এবং তাঁরা শুধু শ্রোতা নন, জিজ্ঞাসু। তাঁরা প্রশ্ন করবেন, তর্ক করবেন, নিজেদের মনের কথা জানাবেন। এরই নাম মেলামেশা। তা নয়, একজন বকে যাবে, আর সবাই শুনে যাবেন! এর জন্যে এত কষ্ট করে ঝালকাঠি যাবার দরকার দেখিনে। আমার কণ্ঠস্বরে এমন কোনো যাদু নেই যে আমার কণ্ঠস্বরই আপনাদের শুনতে হবে এবং রূপও আমার এমন নয় যে আধ ঘণ্টা চেয়ে দেখবার মতো। লেখকের কণ্ঠস্বর তার লেখার মধ্যেই নিহিত থাকে, রূপ থাকে লেখার সর্বাঙ্গে আঁকা। লেখা যদি পড়েন তো লেখকের সত্যিকার রূপ ও সত্যিকার কণ্ঠস্বর পাবেন। তার বেশী পাওয়া যায় আড়ালে আবডালে। লেখক যেখানে মন খোলে। সভামঞ্চে নয়, ঘরোয়া বৈঠকে।

না, ঘরোয়া বৈঠকেও নয়, আরো অন্তরালে। মনে করুন বাংলাদেশ আবার প্রাণ ফিরে পেয়েছে, জেলায় জেলায় যেখানে যত মেলা ছিল সব আবার বেঁচে উঠেছে। বাউল বৈষ্ণব কবিওয়ালাদের মতো ঔপন্যাসিক গল্পলেখিয়ে প্রবন্ধকার ও কবিরা যাচ্ছেন সেসব মেলায় মেলামেশা করতে। এক প্রান্তে আমি আমার বন্ধুদের সঙ্গে গাছতলায় বসে হুঁকো টানছি ও আলাপ করছি, ভোজনের জন্যে সিধা নিয়ে এলেন আপনারা দশ জন অনুরক্ত বা অনুসন্ধিৎসু, মেয়েরা রান্নার আয়োজন করলেন, ইত্যবসরে আমরা সাহিত্যচর্চায় মগ্ন হলুম। তারই নাম সাহিত্যসম্মেলন, এর নাম নয়। সাহিত্যের মধ্যে একটা সহিতের ভাব আছে। আমার সহিত আপনি, আপনার সহিত আমি, তবেই আমাদের সাহিত্য। লেখকের সহিত পাঠকের সাহিত্য ঠিকমতো ঘটছে না বলে আমাদের সাহিত্য আমাদের তৃপ্তি দিচ্ছে না। সাহিত্যের বিরুদ্ধে নালিশ শুনছি প্রত্যেক সভায়, পড়ছি প্রত্যেক পত্রিকায়। যদি আমাদের

জোয়ারভাটার ছন্দে যেমন বদল সাহিত্যের নবযুগ আসত। আমার নিজের বিশ্বাস, "এ নহে কাহিনী এ নহে স্বপন আসিবে সেদিন আসিবে।"

সাহিত্যের নবযুগ সম্বন্ধে আমার ধারণা আগে অস্পষ্ট ছিল, এখন ক্রমে দানা বাঁধছে। সাহিত্য হবে লক্ষ লক্ষ লোকের, কোটি কোটি লোকের, সাহিত্য। সকলে সকলের সঙ্গে মিশবে, সকলের সুখ দুঃখের সাথী হবে, সকলে সকলের সঙ্গে একাত্ম হবে, সেই অর্থে যোগী হবে। সকলে তো লিখতে পারে না, যাদের ক্ষমতা আছে তারাই সকলের হয়ে লিখবে। সে লেখা তাদের হাত দিয়ে সকলের লেখা। সকলে তা পড়বে, পড়ে বলবে, "হাঁ, ঠিক হয়েছে, এই কথাই আমরা বলতে চেয়েছিলুম।" কিংবা বলবে, "না, ঠিক হয়নি। তুমি আবার চেষ্টা কর। হয়তো এবার পারবে।" একালে যেমন সমালোচকরা লেখককে নিরুৎসাহ করেন সেকালে তেমন করবেন না। বলবেন, "হাঁ, তোমার হাত আছে, কিন্তু এ হাত দিয়ে তুমি সকলের লেখা লিখছ কি? নিজেকে জিজ্ঞাসা কর। সকলকে জিজ্ঞাসা কর। নিজেই বুঝতে পারবে কোথায় তোমার লেখার দুর্বলতা। দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠ, কবি। চেষ্টা কর। বার বার চেষ্টা কর।

কে জানে হয়তো এসব আর্ট ফর্ম বদলে যাবে। নতুন আর্ট ফর্ম আপনি তৈরি হবে। আর্ট ফর্ম নিয়ে আমি বৃথা ভাবিনে। আর্টের অন্তঃসার নিয়েই আমার ভাবনা। মানব মানবীর চিরন্তন সুখ দুঃখই আর্টের অন্তঃসার, সাহিত্যের রস। এর কোনো পরিবর্তন নেই। এ বস্তু আজ যেমন আছে কাল তেমনি থাকবে। তা যদি না হতো একেবারে কোন জনক-তনয়ার জন্যে আজো আমরা চোখের জল ফেলতুম না। পাঞ্চালীর অপমান গায়ে পেতে নিয়ে কৌরবদের অভিশাপ দিতুম না ধ্বংস হতে, নির্বংশ হতে। সাহিত্যের রস অপরিবর্তনীয়। কিন্তু এক

যুগের সাহিত্য আরেক যুগের সাহিত্যের থেকে ভিন্ন। কারণ এক যুগের জীবন স্রোত আরেক যুগের জীবন স্রোতের থেকে ভিন্ন।

এ যুগে জীবনস্রোত ও জনস্রোত একাকার হয়ে গেছে। আমরা যেন একথা না ভুলি। বেড়াগুলো এক এক করে ভেঙে যাচ্ছে, মানুষের থেকে মানুষকে আলাদা করে রাখা যাচ্ছে না। এই যুদ্ধে আমরা তার নমুনা দেখলুম। এর পরে চরম দেখব। কিন্তু তার থেকে হয়তো এক উল্টো বিপত্তির উৎপত্তি হবে। মানুষ মনে করবে ব্যক্তি কিছু নয়, সমষ্টিই সব। লেখক যেন শুধু একখানা হাত, তার যেন ব্যক্তিসত্তা নেই। সে যেন গ্রামোফোন রেকর্ডের মতো লিপিবদ্ধ করবার জন্যেই হয়েছে। তার রচনা যেন নৈর্ব্যক্তিক।

এসব কথা এক দিন জোর গলায় শোনা যাবে, কিন্তু এখন থেকেই মিহি গলায় শোনা যাচ্ছে। সমষ্টির সলিলে অবগাহন করলেও লেখক তার ব্যক্তিসত্তা হারায় না, হারাতে পারে না, যদি হারায় তো সে তার সর্বস্ব হারায়, এটা জানিয়ে রাখা ভালো। সকলের সঙ্গে যুক্ত হতে চাই, কিন্তু সেই সঙ্গে আত্মস্থ হতে চাই। লেখক হবে আত্মস্থ পুরুষ, মুক্ত পুরুষ। সকলের সঙ্গে যুক্ত, কিন্তু সর্বতোভাবে মুক্ত। রচনা হবে জীবনরসে জীবন্ত, যৌবনজ্বালায় জ্বলন্ত, শাশ্বত সত্যে অমৃতময়। একাধারে সমষ্টিগত ও ব্যক্তিগত। সকলের হৃদয়, আমার হাত, সকলের অনুভূতি, আমার লেখনী, সকলের ব্যাকুলতা, আমার কণ্ঠস্বর, সকলের কল্পনা, আমার রূপ। কিন্তু সকলে যেমন অস্তিত্ববান আমিও তেমনি অস্তিত্ববান। সকলের মধ্যে আমি, আমার মধ্যে সকলে।

১৯৪৫

রম্যাঁ রলাঁ

রম্যাঁ রলাঁ দেশকে অতিক্রম করতে পেরেছিলেন, এইখানে তাঁর জিত। কালকে অতিক্রম করতে পারেননি, এইখানে তাঁর হার।

এ হার তাঁর একার নয়, একজন কি দু'জন বাদে আর সকলের। অথচ এ জিত তাঁর মতো একজন কি দু'জনের। আমরা আজ বিজেতাকে অভিনন্দন জানাব, কিন্তু বিজিতকেও সমবেদনা জানাতে ভুলব না। আত্মার সঙ্গে আত্মার সম্বন্ধ এমন নিগূঢ় যে হয়তো আমাদের আনন্দ-বেদনা মৃত্যুর পরপারে তাঁর কাছে পৌঁছবে।

আঠারো-উনিশ বছর বয়সে তাঁর "জাঁ ক্রিস্তোফার" আমার হৃদয় হরণ করেছিল। "পীপ্‌ল্‌স্ থিয়েটার" আমাকে অনুপ্রাণিত করেছিল। ইচ্ছা করত, জাঁ ক্রিস্তোফারের মতো বাঁচতে, জনসাধারণের জন্যে লড়াই করতে। জানতুম যে, জনসাধারণ আমাকে বুঝবে না, কিন্তু তাদেরকেও বুঝব না, সেইজন্যে আগে থাকতে শোক করতুম। শোক করতুম আর সুখী হতুম এই ভেবে যে, আমি সেই স্বল্পসংখ্যক দুঃখীজনের একজন যাদের কেউ বুঝবে না, অথচ যারা সকলের জন্যে সর্বস্ব দিয়ে গেছে। যখন বুঝবে তখন আর খুঁজে পাবে না, তার আগে আমরা জ্বলেপুড়ে নিঃশেষ।

এই যে "elite" বা স্বল্পসংখ্যকের মোহ এ মোহ আমার অনেক দিন পর্যন্ত ছিল, এখনো পুরোপুরি যায়নি। কিন্তু রলাঁ তাঁর এ মোহ শেষ বয়সে কাটিয়ে উঠেছিলেন। যদি কেউ কোনো দিন তাঁর জীবনচরিত দরদ দিয়ে লেখেন তা হলে দেখাবেন, এটুকুর জন্যে তাঁকে কী অমানুষিক দুঃখ পেতে হয়েছিলো। নিজেকে স্বল্পসংখ্যকের একজন

শোনা শুনতে যত সহজ আসলে তত নয়। যাঁদের এক ছটাক প্রতিভা আছে তাঁরাও এক-একটি কেষ্টবিষ্টু। রলাঁর মতো দুর্লভ প্রতিভার অধিকারীর পক্ষে নোবেল প্রাইজের সিংহাসন থেকে নেমে চাষী মজুরের সঙ্গে কাঁধ মেলানো ইতিহাসে অপূর্ব। সত্তর বছরের অবিরাম অন্তর্দ্বন্দ্বের পরে তিনি তাঁর জীবনের মূল সমস্যার মীমাংসায় পৌঁছেছিলেন।

তাঁর জীবনের মূল সমস্যা বলেছি। বলা উচিত ছিল, তাঁর সাহিত্যিক বা শিল্প-জীবনের। এ ছাড়া তাঁর আরো একটা জীবন ছিল, নৈতিক আধ্যাত্মিক জীবন। তিনি ছিলেন মূর্তিমান বিবেক। টলস্টয়ের পর ইউরোপের বিবেক ছিলেন তিনি এবং বার্নার্ড শ। বিবেকের সঙ্গে আপোষ দু'জনের মধ্যে একজনও করেন নি। কিন্তু, শ'র বিবেকের চেয়ে রলাঁর বিবেক নির্ভরযোগ্য। গত মহাযুদ্ধে এর অগ্নিপরীক্ষা হয়ে যায়।

তার পর থেকে ইউরোপের বিবেকীদের দৃষ্টি শ'র প্রতি তেমন নয় রলাঁর প্রতি যেমন। কিন্তু এবারকার এই মহত্তর যুদ্ধে দেখা গেল রলাঁর বিবেকও অনির্ভরযোগ্য। বেঁচে থাকলে তিনি আর বিবেকীদের দৃষ্টিপথে পড়তেন না। সে দৃষ্টি পড়ছে অলডাস হাক্সলী প্রভৃতির উপর যদিও এঁরা কেউ রলাঁর মতো, শ'র মতো, বিরাট পুরুষ নন। এইখানেই তাঁর ট্র্যাজেডী।

কিন্তু এর উপর তাঁর হাত ছিল না। এ ট্র্যাজেডী অনিবার্য। তাঁর জীবন আলোচনা করে আমি বুঝতে পেরেছি, তিনি কেন সেবারকার যুদ্ধে যোগ দেননি, কেন এবারকার যুদ্ধে ঝাঁপ দিয়েছেন। কারণটা রাজনৈতিক বললে কিছুই বলা হয় না, কারণটা তাঁর স্বভাবের মধ্যে নিহিত। ওটা তাঁর নিয়তির নির্দেশ। বিবেক হেরে গেছে নিয়তির কাছে। তাঁর দোষ নেই।

আঠারশ শতাব্দীর শেষভাগে ফরাসীদের দেশে যে বিপ্লব ঘটে তার স্মৃতি ফরাসীমাত্রেরই মনোজীবনের অঙ্গ। এমন দিন নেই যেদিন তাদের মনে পড়ে না বিপ্লবী জনতার সুকৃতি বা দুষ্কৃতি, বিপ্লবী নেতাদের জয় বা ক্ষয়। তার পরেও আরো কয়েক বার বিপ্লব ঘটে গেছে সে দেশে। ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের আঠারো বছর পরে রলাঁর জন্ম। তাঁর যখন পাঁচ বছর বয়স তখন আরো এক বার বিপ্লব বাধে, কিন্তু ইতিহাসে তাকে বিপ্লব বলে গণ্য করা হয় না। বলা হয়, কমুনার্ বিদ্রোহ। রলাঁর মনোজগতে এইসব বিপ্লব বা বিদ্রোহের জের চলছিল বাল্যকাল থেকে।

কিন্তু যাদের মাঝখানে তিনি মানুষ তারা মধ্যবিত্ত বা বুদ্ধিজীবী, তাদের স্বার্থ প্রথমবারের বিপ্লবেই সাধিত হয়েছে, দ্বিতীয় বারের অপেক্ষা রাখেনি। দ্বিতীয় বারের বিপ্লবে তাদের যেটুকু সহানুভূতি ছিল তৃতীয় বারের বেলা সেটুকুও রইল না। কমুনার্ বিদ্রোহে তো তাদের সহানুভূতির বদলে অবজ্ঞার ভাব ছিল। মধ্যবিত্তরা বিপ্লবের নেতৃত্ব করা দূরে থাক, বিপ্লবকে হাড়ে হাড়ে ভয় করত। আবার বিপ্লব বাধবে, এতে তাদের অন্তরের সায় ছিল না; তবে তারা ভালো করে বুঝত যে, জনসাধারণকে যদি তাতিয়ে কিম্বা মাতিয়ে রাখা না যায় ওরা বিপ্লবের কথা ভাববে। সেইজন্যে জার্মানীর সঙ্গে আবার করে যুদ্ধ বাধবে, এবার ফ্রান্স জিতবে, এই ছিল তাদের নিত্যকার জল্পনা। আর ছিল আমোদপ্রমোদের ঢালাও ব্যবস্থা। অন্তহীন মত্ততা। এবং স্বৈরতা।

রলাঁ মানুষ হন এই আবহাওয়ায়। তিনিও মধ্যবিত্ত তথা বুদ্ধিজীবী। স্বার্থের দিক থেকে বিচার করলে বুদ্ধিবৃত্তি ও ইন্দ্রিয়সুখ এই তো জীবনের লক্ষ্য। এর জন্যে যত পারো টাকা কামাও, যেমন করে পারো—ছলে বলে কৌশলে। তখনকার দিনের নৈতিক আদর্শ এর উপরে উঠত না। কিন্তু অতি অল্প বয়স থেকে রলাঁর তাতে বিরাগ

লাগে। দ্বিতীয়ত তিনি যখন স্কুলের ছাত্র তখন থেকে টলস্টয়ের শিষ্যকে বলে জীবনের সাধনা তার চরমে উপনীত হয়েও টলস্টয়ের তৃপ্তি হল না, তিনি একে একে সব ত্যাগ করলেন—যা কিছু অর্থকরী, কিছু অনর্থকরী। কী করে মানুষকে ভালোবাসবেন, মানুষের সেবা করবেন—সব মানুষের, দীনহীন মানুষের, এই চিন্তায় টলস্টয় বিভোর, এমন সময় রলাঁর চিঠি, অজানা অচেনা তরুণের চিঠি, তাঁর হাতে পৌঁছয়। অথচ একটি তরুণকে "প্রিয় ভ্রাতা" বলে সম্বোধন করে তিনি যে উত্তর দিয়েছিলেন সে উত্তর দু'কথায় সারবার গোছের নয়। এই তরুণটি যেন তাঁর উত্তরাধিকারী, উত্তরাধিকারীকে সমস্ত জানাতে ও বোঝাতে হয়, তাই তিনি তাঁকে প্রকাণ্ড একখানি পত্র লিখেছিলেন। এই ভাবে রলাঁর মন্ত্রদীক্ষা হল।

স্কুলের পড়া শেষ করে তিনি ইটালী যান, সেখানে দু'বছর কাটান। এক হিসাবে তাঁর শিক্ষানবিশি শেষ হয়েছিল স্বদেশেই। শিক্ষানবিশির পরে এক বছর দেশভ্রমণের রীতি ইউরোপের সনাতন প্রথা। রলাঁর সময়টা কাটল ইটালীর রোম প্রভৃতি অঞ্চলে। সেখানে তাঁর আলাপ হল এক বর্ষীয়সী জার্মান মহিলার সঙ্গে, নাম মালভিডা ফন মাইজেনবুর্গ। ইনি গায়টের সমকালের মানুষ। ভাগ্‌নার, নীট্‌শে, মাৎসিনি, গারিবল্ডি, হার্ৎসেন প্রভৃতির অন্তরঙ্গ বন্ধু। রলাঁকে দেখে ইনি চিনতে পেরেছিলেন তাঁর অন্তরবাসীকে। দু'জনেই আদর্শবাদী, যে আদর্শ মরজগতে অজেয় সেই আদর্শ দু'জনের। মালভিডা তাঁকে আত্মপ্রভাব দিলেন, অস্তগামী ছায়া যেমন পথিককে দেয়। রলাঁ যখন রোম থেকে ফিরলেন তখন তিনি আদর্শনিষ্ঠ হয়ে কৃতসংকল্প। তখন আর তাঁকে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী বলে ভুল করা যায় না। যাদের সে ভুল ছিল তাদের ভুল ভাঙতে দেরি হল না। একজন তাঁকে বিয়ে করলেন ও বিয়ের অল্পকাল পরে আলাদা হলেন।

উপরে যাকে স্কুল বলা হয়েছে তা প্রকৃতপক্ষে কলেজ। রলাঁ ছিলেন সেখানকার অধ্যাপক। পরে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের, প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের, অধ্যাপক হন। পরবর্তী বয়সে তিনি পদত্যাগ করেন। লেখা থেকে যা পেতেন তাতেই তাঁর চলত। সারা জীবন সামান্য খরচে চালিয়েছেন।

ইটালী থেকে ফেরার পরে তিনি যখন সাহিত্যে প্রবেশ করলেন তখন তাঁর প্রিয় বিষয় হল বিপ্লব ও প্রিয় বিভাগ হল নাটক। জনগণের নাট্যশালা বলে তাঁর একটি পরিকল্পনা ছিল। সাধারণ রঙ্গালয় তো আমোদপ্রমোদের দোকান। তার জন্যে নাটক লেখা মানে দোকানদারি। যাতে দু'পয়সা হবে না তেমন কোনো নাটক কেউ অভিনয় করবে না। আর অভিনয় করলেও কেউ পয়সা দিয়ে দেখবে না। অথচ নাটকের মতো সার্বজনীন অভিজ্ঞতাকে আমোদপ্রমোদের আধার করে তাই দিয়ে বণিকবুদ্ধি সম্পাদন যে ঘোর অসভ্যতা ও অনীতি। গ্রীকদের নাট্যশালা গির্জার মতো মন্দিরের মতো বণিকবুদ্ধিহীন ছিল। ফরাসীদের নাট্যশালাও তাই হবে। তার জন্যে তিনি লিখতে লাগলেন বিপ্লবের কাহিনী। বিপ্লবের ও ভাবনিষ্ঠার। কিন্তু লিখলে কি হবে। বিপ্লবের প্রতি মধ্যবিত্তদের মনোভাব প্রসন্ন নয়, তাদের হাতেই কলকাঠি। তাদের মন যোগাতে রলাঁ রাজি নন। সব চেয়ে দুঃখের কথা, জনগণ উদাসীন। হাড়ভাঙা খাটুনির পরে তারা চায় একটু রঙ্গ, একটু বিস্মৃতি। রলাঁ তা দিতে অক্ষম।

এর পরে তিনি নাটক লেখায় ক্ষান্তি দিয়ে জীবনচরিত ও উপন্যাস রচনায় মন দিলেন। এসব জনগণের জন্যে নয়। এগুলিতে বিপ্লবের কথা ছিল না, তবে বিদ্রোহের কথা ছিল। তাঁর মনের তার বিপ্লবের না হোক বিদ্রোহের সুরে বাঁধা প্রথম থেকেই। কিন্তু যুদ্ধের উপর তাঁর আন্তরিক বিরাগ। যুদ্ধ বলতে ফরাসীর কাছে বোঝায় জার্মানের সঙ্গে যুদ্ধ। জার্মান মানে সামন্তিক ফন হাইন্ডেনবুর্গ, জার্মান মানে বেটোফেন।

সংগীতের প্রতি তাঁর আকর্ষণ আশৈশব। তিনি বোধ হয় মনে মনে চেয়েছিলেন সংগীতশিল্পী হতে, ঘটনাচক্রে হয়ে দাঁড়ালেন সংগীতসমালোচক ও সাহিত্যিক। সংগীত ভালোবাসতেন বলে সংগীতনায়কদেরও ভালো-বাসতেন। তাঁদের মধ্যে বেটোফেনকেই ভালোবাসতেন সকলের চেয়ে বেশি। বেটোফেন ছিলেন তাঁরই মতো বিপ্লবী বা বিদ্রোহী। সেই বেটোফেনের স্বজাতির বিরুদ্ধে অসিধারণ? রলাঁর জন ক্রিস্টোফারও জার্মান। জন ক্রিস্টোফার-এর স্বদেশের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ? কখনো নয়। যুদ্ধ যদি আর কারো বিরুদ্ধে হ'ত তা হলে হয়তো কথা ছিল। কিন্তু আর কারো বিরুদ্ধে হলেও তিনি যুদ্ধবিরোধী হতেন। কারণ, তাঁর মনটা আন্তর্জাতিক। তিনি জাতিভেদে বিশ্বাস করতেন না। সেইজন্যে তাঁর পক্ষে কঠিন হ'ত যে কোনো জাতির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ।

অথচ তিনি যে ঠিক অহিংসাবাদী ছিলেন তা নয়। তা যদি হতেন বিপ্লবের কথা ভাবতেন না। বিপ্লব কি কোনো দিন বিনা রক্তপাতে হয়েছে? না, তিনি তা জানতেন। সেইজন্যে তাঁকে অহিংসক বলে ধরে নেওয়া যায় না। কিন্তু টলস্টয়ের প্রভাবে তিনি অহিংসার প্রয়োজন মানতেন। বিপ্লব বা বিদ্রোহ ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য যদি অহিংস-ভাবে সিদ্ধ হয় তো অহিংসাই শ্রেয়, যদি না হয় তো হিংসার আশ্রয় নিতে হবে। উপায়কে উদ্দেশ্যের উপরে স্থান দিলে চলবে না। এটা যে কেবল তাঁর শেষ বয়সের যুক্তি তা নয়, এ যুক্তি বরাবরই তাঁর মনের তলে প্রচ্ছন্ন ছিল। কিন্তু একবার যদি এ যুক্তিকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় তো যুদ্ধবিগ্রহেরও সমর্থন করা হয়। যুদ্ধবিগ্রহকে সমর্থন করলে জার্মানীর বিরুদ্ধে ইটালীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ বাধে। বেটোফেনের বিরুদ্ধে, মাইকেল এঞ্জেলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ? ক্রিস্টোফার-এর বিরুদ্ধে, গ্রাৎসিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ? অসম্ভব।

গত মহাযুদ্ধের মধ্যভাগে রাশিয়ায় যখন বিপ্লব ঘটে তখন রলাঁ পড়লেন দোটানায়। বিপ্লবী তিনি, তাঁর তো আনন্দে উদ্বেল হওয়া উচিত। লেনিন নাকি তাঁকে সহযাত্রী হতে ডেকেছিলেন সুইট্জার্ল্যাণ্ড থেকে রুশ দেশে। তিনি গেলেন না। বিপ্লব হলেই প্রতিবিপ্লব হবে, উভয় পক্ষে কাড়াকাড়ি বেধে যাবে, তার মানে গৃহযুদ্ধ। তাই হ'ল রাশিয়ায়। যুদ্ধের বিরুদ্ধে যিনি সুইট্জার্ল্যাণ্ড থেকে প্রচারকার্য চালাচ্ছিলেন তিনি কেমন করে গৃহযুদ্ধের পোষকতা করবেন? অসংগতির অপবাদ রটত। তবে এ কথাও ঠিক যে, তিনি রক্তপাতে কাতর ছিলেন। ইতিহাসের বৃহত্তম যুদ্ধ-জনিত যে অবাধ রক্তপাত ও অপরিমিত লোকক্ষয় ইউরোপের বক্ষ ব্যাকুল করেছিল রলাঁর বুকে বাজছিল সেই ব্যাকুল ব্যথা। এর উপর আবার বিপ্লব! তিনি প্রস্তুত ছিলেন না তার জন্যে।

মহাযুদ্ধের পরেও বহুকাল যাবৎ প্রস্তুত ছিলেন না। বিপ্লব যে মন্দ, এ যুক্তি তাঁর নয়। তাঁর যুক্তি, বিপ্লবের পদ্ধতি মন্দ। উদ্দেশ্য মন্দ নয়, উপায় মন্দ। বারবুসকে লিখেছিলেন :—

I wrote in *Clérambault* (and I am more than ever of that opinion): It is not true that the end justifies the means. The means are ever more important for true progress than the end. . . . For the end (so rarely reached and always incompletely) but modifies the external relations between men. The means, however, shape the mind of men according either to the rhythm of justice or to the rhythm of violence.

কিন্তু উপায়ের উপর এতটা জোর দিলে প্রকারান্তরে বিপ্লবের মূলোচ্ছেদ করা হয়, কারণ ইতিহাসে এমন বিপ্লব কোথায় যাতে উপায়ের শুচিরক্ষা হয়েছে? এই স্বতোবিরোধ রলাঁকে বিকল করত

যদি না তিনি আকস্মিকভাবে আবিষ্কার করতেন গান্ধীকে। গান্ধীও বিদ্রোহী জননায়ক, অথচ তাঁর উপায় অশুদ্ধ নয়। রলাঁর মন যা চায় তিনি তাই, তিনিই সেই বিপ্লবী যাঁর যুক্তি বিপ্লবের মূলোচ্ছেদ করে না। গান্ধীকে রলাঁ ইউরোপের বিপ্লবী মহলে পরিচয় করিয়ে দিলেন। কিন্তু ইউরোপের বিপ্লবীদের সম্মুখে তখন জরুরি প্রশ্ন : সোভিয়েট রাশিয়া যদি বিপন্ন হয় তা হলে কি উপায়ের কথা ভেবে সময় নষ্ট করা উচিত? রলাঁর গান্ধীচরিত এ প্রশ্নের উত্তর নয়। রলাঁ তা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই শেষ পর্যন্ত উপায়ের অশুদ্ধতা মেনে নিয়েছিলেন।

ভালো লোক মন্দ লোক এত কাল পরে একটা বিপ্লব ঘটেছে, তার ফলে জনসাধারণের অধিকার ও ক্ষমতা বেড়ে গেছে, এটা তো স্পষ্ট। কথা হচ্ছে, তার দুর্দিনে তাকে বাঁচাতে হলে হিংসার আশ্রয় নেওয়া চলবে কিনা? রলাঁ বললেন, চলবে। যদি সোভিয়েটকে নিয়ে যুদ্ধ বাধে তা হলে যুদ্ধে যোগদান চলবে কিনা? রলাঁ বললেন, চলবে। এমনি করে তিনি যুদ্ধবিরোধী থেকে যুদ্ধসমর্থক হয়ে উঠলেন। কিন্তু এর জন্যে তাঁর অন্তর্দ্বন্দ্বের সীমা ছিল না। জার্মানীর সঙ্গে ইটালীর সঙ্গে যুঝতে হল ফ্রান্সকে। বেঠোফেনের সঙ্গে মাইকেল এঞ্জেলোর সঙ্গে তাঁকে। কী প্রগাঢ় বেদনা! এ যেন নিজের হাতে নিজের পাঁজর ভাঙা।

খানিকটা আত্মপ্রতারণাও ছিল। রলাঁ মনে করেছিলেন, সময়মতো হস্তক্ষেপ করলে যুদ্ধ বাধবেই না। "য়্যাকশন্" "য়্যাকশন্" বলে তিনি যখন হাঁক ছাড়তেন তখন এই কথাটাই বোঝাতে চাইতেন যে, সময় থাকতে চেষ্টা করলে যুদ্ধ বন্ধ হবে। আমাদের অনেকেরই সেই ধারণা ছিল। হিটলারকে উঠতে না দিলে কি এত বড় যুদ্ধ বাধত? মুসোলিনিকে বাড়তে না দিলে কি হিটলারকে নামানো এত শক্ত হত? রলাঁর যুক্তি এক হিসাবে যুদ্ধবিরোধীরই যুক্তি। কিন্তু আমরা যেমন

ছেলেমানুষ ছিলুম তিনিও তেমনি শিশু ভোলানাথ। জানতেন না যে, সরষের ভিতর ভূত থাকে।

লাভের মধ্যে হল এই যে, রলাঁর নৈতিক উচ্চতা টলস্টয়ের ধারেকাছেও রইল না। গান্ধীর কাছে তো নয়ই। নিয়তি।

তবে রলাঁ ছিলেন স্বভাবশিল্পী, সুযোগ পেলেই পিয়ানো নিয়ে বসতেন, বেটোফেন বাজাতেন। নাটক বা উপন্যাস লিখতেন। লিখতেন সংগীতবিষয়ক প্রবন্ধ। মহাপুরুষদের জীবনবৃত্ত। জীবনচরিত। তাঁর রামকৃষ্ণবিবেকানন্দচরিত একপ্রকার শিল্পকাজ। ও বই লিখে তিনি সোভিয়েট রাশিয়ার বা বিপ্লবী ইউরোপের জিজ্ঞাসা দূর করেননি। ভারতের আত্মার সঙ্গে পরিচয় করিয়েছেন ইউরোপের আত্মার। সাধনার সঙ্গে সাধনার। আবিষ্কার করে আনন্দিত হয়েছেন যে, বাইরে আমাদের দূরত্ব যত হোক অন্তরে আমরা নিকট। এই আবিষ্কার তাঁকে শান্তি দিয়েছে শেষ বয়সের চরম অশান্তির মাঝে। বল দিয়েছেও।

সাহিত্য হিসাবে তাঁর জীবনবৃত্তগুলির মূল্য কত জানিনে। তাঁর নাটক বেশী পড়িনি, মূল্য আমার অজানা। দু'খানি উপন্যাস পড়েছি—"জন ক্রিস্টোফার" ও "মন্ত্রমুগ্ধ আত্মা"। দ্বিতীয়টি শেষ করিনি। যতদূর পড়েছি তার উপর নির্ভর করে বলতে পারি প্রথমটির সমান হয়নি, কিন্তু তার চেয়েও গভীর হয়েছে। রসঘন হয়েছে। হয়েছে মর্মস্পর্শী।

উভয় গ্রন্থেই গ্রন্থকারের মনে একই জিজ্ঞাসা। কেমন করে বাঁচব? একই উত্তর, মিথ্যার সঙ্গে আপস করব না, সত্য করে বাঁচব। এর দরুন যদি দুঃখ পেতে হয়, দুঃখ পাব, এড়াব না। জীবনে বহু দুঃখ আছে, তা জেনেও জীবনকে ভালোবাসব। সেই তো বীরত্ব। মর্ত্য-লোকে একমাত্র বীরত্ব।

ক্রিস্টোফার ও আনেৎ দুই উপন্যাসের নায়ক নায়িকা উভয়েই অসুখী। তাদের সুখী করার জন্যে তাদের স্রষ্টার বিন্দুমাত্র প্রয়াস

নেই। কিন্তু যাতে তারা খাঁটি থাকে, পোড়খাওয়া সোনার মত খাঁ স্রষ্টাকর্তার সমস্তক্ষণ লক্ষ্য। সাংসারিক অর্থে তারা সাধু বা সাধ্বী ন কিন্তু উচ্চতর অর্থে তারা শুদ্ধ, তারা নির্মল। পিউরিটি বলতে ব বোঝানো উচিত তার একজোড়া নতুন উদাহরণ দিয়ে গেলেন রলাঁ হয়তো শুধু এইজন্যেই তাঁকে এ দুটি মহাভারত রামায়ণ লিখতে হয়েছি এত কাল ধরে।

মহাভারত-রামায়ণের সঙ্গে এ দুটি এপিক উপন্যাসের তুলনা করা আর এক কারণে। উভয়েরই অন্তরালে রয়েছে দুই প্রলয়ংকর যু ভাবী যুদ্ধের ছায়া পড়েছে "জন ক্রিস্টোফার"-এর উপরে। "মন্ত্রমু আত্মা"র উপর ভূত ভবিষ্যৎ উভয় যুদ্ধের ছায়া। সুতরাং পরোক্ষ ভা এ দুখানি যুদ্ধকাব্য। উচ্চাঙ্গের কিনা, স্মরণীয় কিনা, সে বিচা মহাকাল করবে।

আমাদের কারো কারো জীবনে রলাঁর এ দুটি পুঁথি স্থায়ী প্রভা রেখে গেছে। বিংশ শতাব্দীর ইউরোপে "জন ক্রিস্টোফার" অপ্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে ওর সমকক্ষ অনেক। ও চেয়েও মাথায় উঁচু টলস্টয়-ডস্টোয়েভ্স্কির একাধিক উপন্যাস। রলাঁর স্থান সাহিত্যের সভায় তাঁদেরই পাশে। তবে "জন ক্রিস্টোফার" ও "মন্ত্রমুগ্ধ আত্মা" প্রধানত জীবনজিজ্ঞাসুদের জন্যে। "সমর ও শান্তি" ও "কারামাজভ" জীবনজিজ্ঞাসু তথা সর্বসাধারণের জন্যে।

"জন ক্রিস্টোফার" বিশেষ করে সংগীতপ্রেমিকদের জন্যে। এর পাতায় পাতায় সংগীত-প্রসঙ্গ। বোধ হয় বেঠোফেনের জীবনী লিখে রলাঁর সংগীত সম্বন্ধে বলবার কথা ফুরয়নি, তার সঙ্গে মিলেছে সাহিত্য সম্বন্ধে বক্তব্য। ক্রিস্টোফারের সঙ্গে অলিভিয়রের। জার্মানের সঙ্গে ফরাসী। ক্রিস্টোফারকে জার্মান না করলে কি চলত না? না, চলত না। উঁচুদরের সংগীতকার যাঁরা তাঁদের শিক্ষা এক পুরুষের নয়,

তিন-চার পুরুষের। বাখ্ ও বেটোফেন প্রভৃতি পুরুষানুক্রমে সংগীতশিল্পী। জার্মানীতে এর ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত, ফ্রান্সে বিরল। তার পর, সংগীতশিক্ষা তো কেবল পরিবারে হয় না, হয় রাজা-রাজড়ার দরবারে। জার্মানীতে শত শত দরবার ছিল একশো বছর আগেও। ফ্রান্সে বড় জোর ছিল একটি। তার পর জার্মানী এমন দেশ যে তার ছোট বড় সব শহরেই থিয়েটার অপেরা কনসার্ট ও সেই জাতীয় অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান অজস্র/অগুনতি। পাড়ায় পাড়ায় জলসা, ঘরে ঘরে গানবাজনা। কাজেই ক্রিস্টোফারকে জার্মান করতেই হল। কিন্তু জার্মানীতে তখন সামরিকতার বাড়াবাড়ি, ছুতে কর্তাদের সঙ্গে মুখ সামলে কথা কইতে হয়, কথায় কথায় বিধিনিষেধ। স্বাধীনচেতা ক্রিস্টোফারকে তাই বিপদে পড়ে ফেরার হতে হল প্যারিসে। সেখানে তার ধীরে ধীরে পসার জমল, নামডাক হল। প্যারিস যদিও ফ্রান্সের রাজধানী তবু আন্তর্জাতিকতার পীঠস্থানও বটে। গুণী লোক যেদেশের ফরাসীরা খাতির করে। ক্রিস্টোফার তাদের একজন হয়ে উঠল, ফ্রান্সকে ভালোবাসল অলিভিয়েরকে বন্ধু পেয়ে। এদের দুজনের বন্ধুতা প্রেমের চেয়েও নিবিড়। দেশের ব্যবধান অলীক, ভাষার ব্যবধান অলীক।

অলিভিয়ের আদর্শবাদী সাহিত্যিক। ক্রিস্টোফার আদর্শবাদী সংগীতকার। এমনি আরো কয়েকজন আদর্শবাদীকে ও বাস্তববাদীকে আমরা পাচ্ছি, তাদের কেউ নারী কেউ পুরুষ। তাদের এক-এক জনের এক-এক ধারা, এক-এক দিকে গতি। একজনের নাম ফ্রাঁসোয়াজ উদোঁ। অভিনেত্রী। এঁর সম্বন্ধে গ্রন্থকার বলেছেন :

"But especially he was indebted to her for a better understanding of the theatre; she helped him to pierce through to the spirit of that admirable art, the most perfect of all arts, the fullest and most sober. She revealed to him the beauty of that magic

instrument of the human dreams,—and made him see that he must write for it and not for himself, as he had a tendency to do. . . . Françoise's ideas were in accordance with Christopher's who, at that stage in his career, was inclined towards a collective art, in communion with other men. Françoise's experience helped him to grasp the mysterious collaboration which is set up between the audience and the actor . . . It was this common soul which it was the business of the great artist to express.

এর পরে আধুনিক ইউরোপ সম্বন্ধে বলা হয়েছে :

Modern Europe had no common book: no poem no prayer, no act of faith which was the property of all. Oh! the shame that should overwhelm all the writers, artists, thinkers, of to-day! Not one of them has written, not one of them has thought, for all. Only Beethoven has left a few pages of a new Gospel of consolation and brotherhood: but only musicians can read it, and the majority of men will never hear it.

রলাঁর সাধ ছিল সংগীতকার হতে। বিধাতা বাদী। পূর্বপুরুষেরা সংগীতশিল্পী নন। নাট্যকার হতে স্পৃহা ছিল। তাঁর স্পৃহা থাকলে কী হবে, লোকের আগ্রহ ছিল না। বার বার ফিরে যায়। এবার ঔপন্যাসিক। এবার সিদ্ধার্থ।

কিন্তু তাঁর সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথাই বলা যায় বেটোফেন সম্বন্ধে যা তিনি বলে গেছেন। একটু ঘুরিয়ে বললে যা দাঁড়ায় তা এই :

Rolland has left a few pages of a new Gospel of consolation and brotherhood: but only seekers after Life can read it, and the majority of men will never hear it.

কবিতা কেন উপেক্ষিতা

মণীন্দ্রলাল জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এ যুগের লোক কাব্য পড়ে না কেন? রলাঁ বলেছিলেন, এ যুগের লোকের সুখ দুঃখের কথা কেউ কাব্যে লেখে না বলে। ভিক্তর উগোর মতো জনসাধারণের কবি থাকলে জনসাধারণ কাব্য পড়ত বৈকি। রলাঁর এই উত্তর আমাকে তখনকার মতো নিরস্ত করলেও একেবারে নিশ্চিন্ত করেনি। রলাঁ কোনোদিন কবিতা লেখেননি, আমি লিখেছি। যাদের কথা লিখেছি তারা সংখ্যায় দু'জন হলেও তাদের সুখ দুঃখ সকলেরই সুখ দুঃখ। তা যদি না হতো রাম সীতার সুখ দুঃখ বিশ্বজনীন হতো না।

তা হলে কি সুখ দুঃখ বলতে রলাঁ ব্যক্তিগত সুখ দুঃখ নয়, সমষ্টিগত সুখ দুঃখের কথা বুঝেছিলেন? মহাযুদ্ধ, মহামারী, মন্বন্তর, বিপ্লব, বিদ্রোহ, ধর্মঘট, এই সব? তা যদি হয় তবে স্বীকার করতে হবে যে এ যুগের কবিরা এ জাতীয় সুখ দুঃখের কথা খুব বেশী লেখেন না। রাশিয়ার কবিদের খবর রাখিনে। অন্যান্য দেশের খবর যা পাই তার থেকে মনে হয় এ ধরনের সুখ দুঃখ কবিদের হতবাক করে। যদি বা তাঁরা মুখ খোলেন তো আভাসে ইঙ্গিতে বলেন, সে-ভাষা লক্ষ লক্ষ লোকের মুখের ভাষা নয়, তাই সেসব কাব্যগ্রন্থের পাঠক হাজার জনের বেশী নয়। প্রাণ খুলে গলা ছেড়ে বায়রনী গান ধরলে হয়তো জেল কিংবা গারদ কোনো এক জায়গায় আটক করবে, অন্তত বই বাজেয়াপ্ত করবে, এ রকম ভয়ও আছে বলে মনে হয়। ভিক্তর উগো দীর্ঘকাল নির্বাসনে কাটিয়েছিলেন, শেলী কীটস ও বায়রন স্বেচ্ছায় নির্বাসিত হয়েছিলেন, হুইটম্যান একখানি কি দু'খানি বই লিখে আর লিখলেন না, সেও

এক প্রকার নির্বাসন। জনসাধারণ যাদের কবিতা পড়তে ভালব
তাদের কপালে আর কিছু না হোক দেশান্তর। এ শুধু কবি
খেলায় নয়। টুর্গেনিভের স্থান হলো না রাশিয়ায়, ইবসেনের নরওয়ে
জর্মাণ ল্যাণ্ডে। আমি এর পক্ষপাতী নই। বনস্পতিকে বন থে
বনান্তরে নিলে তার রসের উৎস শুকিয়ে যায়। সাহিত্যের উৎ
শুকিয়ে যায় যদি সাহিত্যিক যান নির্বাসনে। তাঁকে যেমন ক
হোক স্বদেশেই থাকতে হবে, লক্ষ লক্ষ লোকের মুখের ভাষায় প্র
খুলে লিখতে হবে ব্যক্তিগত সমষ্টিগত উভয়বিধ সুখ দুঃখের কথা, কাে
অথবা নাটকে, গল্পে অথবা উপন্যাসে। আভাসে ইঙ্গিতে নয়, চোরে
মতো নয়। এই হলো আদর্শ। এর জন্যে যদি সাজা পেতে হয় সে
সাজাই পেতে হবে। প্রাণদণ্ড, কারাদণ্ড, সম্পত্তিনাশ। কি
নির্বাসন নয়।

তবে এ কথাও মনে রাখা দরকার যে জনসাধারণেও দোষ আছে। জনসাধারণের মূল্যবোধ অনেক সময় ভ্রান্ত। আজকের দিনে উদ্ভ্রান্ত। তাদের মূল্যবোধ মেনে নিলে যা হয় তা সাহিত্য নয়, তা সিনেমা। সাহিত্যের ভিতর এখন সিনেমার রোমান্স ঢুকেছে, তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে প্রোপাগাণ্ডা। এ-স্থলে কেউ যদি গণ্ডগোলের বাইরে গিয়ে আত্মরক্ষা ও সাহিত্যের চরিত্ররক্ষা করেন তো উচিত কাজই করবেন। জনসাধারণ যদি তাঁর রচনা আস্বাদন না করে তো জনসাধারণই বঞ্চিত হবে, তিনি নন। লোকে তাঁর কবিতা পড়ে না তো কী হয়েছে! লোকে কি সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখে! বুলবুলের ডাক শোনে! গোলাপের ঘ্রাণ নেয়! প্রকৃতির সঙ্গে তাদের যেমন ভাশুর-ভাদ্রবৌ সম্পর্ক, কবিতার সঙ্গে তেমন হলে আশ্চর্য্য হবার কী আছে!

কিন্তু লোকে না পড়লে বাস্তবিক মনে লাগে। আমরা অনেকেই কবি হয়ে সাহিত্যের আসরে এসেছিলুম, আসরে বসে দেখলুম কবিতার

আদর নেই। তখন গল্প উপন্যাসের বায়না নিত্য। বেচারি কবিতা হলো কাব্যের উপেক্ষিতা। এ যেন একজনের প্রেমে পড়ে আর একজনের কাছে বরপণ নেওয়া। প্রেমের সুখ বিয়ের সুখ দুই সুখ গেল। সংসার ধর্ম, দৈব ধর্ম, এ-সব কর্ম করে যশ ও অর্থ এলো। তার পর কালে ভদ্রে এক আধ ছত্র কবিতা লেখা গেল। কিংবা গতর খাটিয়ে রাত জেগে কবিতা লেখাও চলল, উপন্যাস লেখাও। গায়ের জোরে লিখলে কারিগরি থাকে, যাদুকরী থাকে না। অবশ্য যাদের বহুমুখী প্রতিভা তাদের কথা আলাদা। তারা বহুজনের প্রেমিক, একজনের পতি নয়। তারা কবিতা বা প্রবন্ধ যাই লিখুক তাতে যাদুকরী থাকে, কারিগরিও। কিন্তু একথাও ঠিক যে একনিষ্ঠতার অভাবে গভীরতার অভাব ঘটে। এইজন্যে প্রজাপতিদের চেয়ে পতিব্রত ভালো। মহাকবি শেকস্পীয়র নাটক লিখলেন অনেক, কবিতা লিখলেন কয়েকটি। কবিতাও লিখতে পারতেন অনেক। কিন্তু সেটা হতো নিছক গায়ের জোরে, নিপট কারিগরি। গ্যেটের পক্ষে নাটক লেখা কঠিন ছিল না, তাঁর হাতে রাজার থিয়েটার ও তাঁর অধীনে এক-দল উপযুক্ত নটনটীও ছিল। অথচ একমাত্র ফাউস্ট লিখতে তাঁর পঞ্চাশ বছর লাগল। সব্যসাচীদের ক্ষমতা নিয়ে তাঁর জন্ম। কিন্তু সে ক্ষমতা তিনি শত ধারে বর্ষণ করে অপচয় করেননি।

যা বলছিলাম, লোকে না পড়লে সাংঘাতিক মনে লাগে। বোধ হয় শেকস্পীয়রেরও মনে লেগেছিল, তাই তিনি কবিতা ছেড়ে নাটক ধরলেন। বঙ্কিম ছিলেন কবি, হলেন কথক। বেচারি কবিতার এ দশা তা বলে আজকের নয়। সাহিত্য বলতে একদা শুধু কাব্যই বোঝাত। তার পরে এল নাটক। তার পরে কথা ও কাহিনী। শেষ কালে প্রবন্ধ। লোকে আর কাব্য পড়ে না বলে আফসোস করে কী হবে, লোকে তো নাটক দেখে, কাহিনী শোনে, প্রবন্ধ পাঠ করে।

প্রতিযোগিতায় কবিতা হটে যাচ্ছে, একচেটে কারবার হলে হটত না। যদি কোনো ডিকটেটর কী মনে করে তাঁর রাজ্যে গল্প উপন্যাস নাটক প্রহসন প্রবন্ধ নিষেধ করে দেন তা হলে লোকে আবার সেকালের মতো কাব্যই পড়বে। আমরা একধার থেকে কবিতা চালান দেব, তাতে যদি জনসাধারণের সুখ দুঃখের কথা না থাকে—যদি থাকে বুলবুল আর সুরা আর সাকী—তা হলেও তারা আদর করে পড়বে ও কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে সুর ভাঁজবে।

কিন্তু তেমন ডিকটেটর এ যুগে সম্ভব নয়। বরং অধিকতর প্রতিযোগিতারই সম্ভাবনা। কবিতা ক্রমে আরো কোণঠাসা হবে, আশ্রমে আস্তানা গাড়বে। নাটক তো লোপাট হতে চলল সিনেমার উৎপাতে। প্রোপাগাণ্ডার তাড়া খেয়ে উপন্যাসও ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। মনে হয় ভাবী যুগটা প্রবন্ধের। ইচ্ছা করলে সে জিনিস পদ্যেও লেখা যায়। লিখছেনও অনেকে। যাঁরা লিখছেন তাঁরা জানেন না যে প্রবন্ধ। লোকেও জানে না, জানলে আদর করে পড়ত। কবিতার উপর বোধ হয় ওদের জাতক্রোধ হয়েছে।

১৯৪৬

কথাসাহিত্য

আমার ছোট ছেলে যখন আরো ছোট ছিল তখন তাকে রোজ রাত্রে গল্প বলে ঘুম পাড়াতে হতো। ডাক পড়ত আমাকে। গল্পটা নতুন হওয়া চাই। শুধু নতুন হলে চলবে না, হবে পক্ষিরাজের গল্প। পক্ষিরাজ ঘোড়ায় নিত্য নতুন অ্যাডভেঞ্চার মুখে মুখে বানিয়ে বলা ছিল আমার দৈনিক কর্তব্য। যেটা তার মনে দাগ রেখে যেত সেটা দিনকয়েক বাদে আবার শুনতে চাইত। হয়তো আমার মনে নেই, তার মনে আছে, মনে করিয়ে দিত। বার বার শুনেও তার তৃপ্তি হতো না, এমন গল্পও ছিল।

সব দেশের সব বয়সের পাঠক পাঠিকার ভিতরে একটি চির শিশু আছে। সে চায় নতুন গল্প, নতুন উপন্যাস। 'নভেল' কথাটার মানে কী? না নতুন। নতুন না হলে তার কৌতূহল জাগে না, কৌতূহল না জাগলে সে পড়তে চায় না। আমাদের প্রতিদিনের কাজ তাকে নূতনত্বের স্বাদ যোগানো। জগতে নূতনত্বের অভাব নেই। চোখ কান খোলা রাখলে কত নতুন মুখ চোখে পড়ে, নতুন কথা কানে আসে। লিখতে জানলে যে কেউ নতুন গল্প, নতুন উপন্যাস লিখতে পারেন। থানায় বা আদালতে, খবরের কাগজের অফিসে বা রাজনীতির আড্ডায়, চায়ের দোকানে বা রেলগাড়ীর কামরায় প্রতিদিন যান তো প্রতিদিন কথাসাহিত্যের উপাদান পাবেন। যুদ্ধ কিংবা বিপ্লব অবশ্য প্রতিদিন ঘটে না, কিন্তু কেউ যদি সে সময় উপস্থিত থাকেন তো উপাদানের ঝুলি ভরে উঠবে। ঝুলি ঝাড়লেই ঝরে পড়বে মাসে একটা গল্প, বছরে একখানা উপন্যাস। ডিকেন্স প্রত্যহ লণ্ডনশহরের অলিগলি ঘুরতেন রকমারি মানুষের সন্ধানে। টলস্টয় ডায়েরি রাখতেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রজাদের

সুখ-দুঃখের কাহিনী শুনতেন যখনি মহালে যেতেন। শরৎচন্দ্র ছিলে গাঁয়ের লোকের দাদাঠাকুর। তারা তাঁর কাছে প্রাণ খুলত। এমনি কং দেশবিদেশের কথাসাহিত্য গড়ে উঠেছে। এর ভিত্তি হচ্ছে অভিজ্ঞত। আমরা আজ রাশিয়ার গল্প এত পড়ি কেন? কারণ সে দেশে নিত্য নতু পরীক্ষা চলছে মানুষের সমাজ ও রাষ্ট্র নিয়ে।

কিন্তু সব দেশের সব বয়সের পাঠক পাঠিকার যেমন নূতনত্বের জন্যে কৌতূহল আছে, তেমনি আছে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি পক্ষপাত। প্রেম, বীরত্ব, সংঘাত, য়্যাডভেঞ্চার, মৃত্যু, এসব বিষয়ে রাশি রাশি গল্প উপন্যাস লেখা হয়েছে সব ভাষায়। আমার ছোট ছেলের কাছে যেমন পক্ষি-রাজের গল্প, অধিকাংশ পাঠক পাঠিকার কাছে তেমনি নারীচরিত্র, পুরুষ-ভাগ্য। সোভিয়েট রাশিয়াতেও এর ব্যতিক্রম ঘটে নি, ঘটতে পারে না, কারণ অধিকাংশ পাঠক পাঠিকা দাম দিয়ে আর কিছু কিনবে না, কিনতে বাধ্য হলে পড়বে না। অধিকাংশের রুচিরোচন বিষয়ের সীমা মেনে নিয়ে সেই সীমার মধ্যে অল্পসংখ্যকের রুচির জন্যে একটু স্থান করে নেওয়া হচ্ছে সার্থক শিল্পীর কাজ। স্বয়ং শেক্সপিয়ার ... করে গেছেন, এখন পর্যন্ত কেউ তাঁকে অতিক্রম করেননি। ... বাংলা নাটকের ও উপন্যাসের বিষয় মোটের উপর এক। যাদের জন্যে আমরা লিখি তাদের কোন্ দিকে ঝোঁক এ যদি না জানি তো বৃথা লিখছি। মানুষের স্বভাব না জেনে মানুষের সাহিত্য সৃষ্টি করা যায় না।

মানুষ যেসব বিষয় ভালোবাসে সেসব বিষয়ে শত শত গল্প উপন্যাস প্রতি মাসে লেখা হচ্ছে। তাদের মধ্যে একটি কি দুটি হয়তো শতবর্ষ পরেও মানুষের মনে থাকবে, ভালো লাগবে। এগুলিকে বলা হবে ক্লাসিক। বাংলা ভাষায় ক্লাসিক বেশী নেই। উনবিংশ শতাব্দীর এমন একখানা উপন্যাসের নাম করা শক্ত যেখানা একবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত চলতে থাকবে। নূতনত্বের দুর্বলতা এইখানে যে তা বছর ঘুরলেই

পুরাতন হয়। যেমন নূতন পত্রিকা। সেইজন্যে শিল্পীকে সন্ধান করতে হয় চিরন্তনের। যা চিরন্তন তা চির নূতন। তা কোনো দিনই পুরাতন নয়। চিরন্তন সত্যের সন্ধান যিনি পেয়েছেন তিনি যদি শক্তিমান লেখক হয়ে থাকেন তো তাঁর দু' একটি রচনা ক্লাসিক হতে পারে। ক্লাসিকের মধ্যেও কতক আছে যা বহুজনের প্রিয়, যেমন শেক্সপিয়ারের নাটক। কতক আছে যা অল্প কয়েকজনের প্রিয়, যেমন কালিদাসের কাব্য।

আমরা যারা বাংলা উপন্যাস লিখি তারা যেন ক্লাসিক রচনায় মন দিই। লেখা মাত্রেই জীবনপাত। জীবনপাত করে যদি বহুজনের জীবনে বহুকাল ধরে জীবনলাভ করি তো জীবনপাত করা সার্থক। কেবল জীবনলাভ নয়, জীবনদানও বটে। কারণ ক্লাসিক মাত্রেরই জীবনদায়িনী শক্তি অসীম। লোকে তার থেকে জীবন পায় বলেই শতাব্দীর পর শতাব্দী তার স্রোতে অবগাহন করে। তাতে যদি কিছু পঙ্কিলতা থাকে তো উপায় নেই। জীবনের স্রোত নির্মল নয়। ভাগীরথীর স্রোতের মতোই ঘোলা।

১৯৪৭

পত্র লেখা

বাঁকুড়া

১৭-৪-৪২

প্রিয়বরেষু,

……আট বছর আগে আমি হঠাৎ কবিতা লেখা ছেড়ে দিই কাজের চাপে ছাড়তে হলো এই বোধ হয় যথার্থ কারণ; কিন্তু যে দুটি কারণ আমি গভীর ভাবে অনুভব করেছি সে দুটি আপনাকে বলি। একটি হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব থেকে পালিয়ে বাঁচবার ইচ্ছা, আর একটি বাংলা কবিতার ভাষা কেমন হবে তা না বুঝে প্রচলিত ভাষায় লেখার বিড়ম্বনা। অর্থাৎ আমি দেখলুম যাই লিখি না কেন তাতে রবীন্দ্রনাথের প্রতিধ্বনি থাকছে। সেটা থাকলে আমার বৈশিষ্ট্য থাকে না। এবং যে ভাষায় লিখি সে ভাষা পচে গেছে। সে ভাষায় লেখা কবিতায় freshness নেই, তা বাংলার মাটির সঙ্গে মেলেনা, সে এক প্রকার dead language।

এই দীর্ঘ আটবছর রবীন্দ্রপ্রভাব কাটিয়ে উঠেছি বলে বিশ্বাস হয় নিজের মনে। আর ভাষারও একটা হদিস পেয়েছি, যদিও এখনো তা পরীক্ষাধীন। আমার অভিজ্ঞতার দ্বারা আপনার বইখানি (দক্ষিণায়ন) যাচাই করে কী দেখলুম? দেখলুম ওতে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব পড়েনি। আপনি এ বিষয়ে আমার চেয়ে ভাগ্যবান। কিন্তু ভাষা সেই পোষাকী প্রাচীন সংস্কৃত বাংলা। আপনি কি ওতেই সন্তুষ্ট? বাংলা কবিতার ভাষা দেশজ ও স্বাভাবিক না হ'লে তার কোনো ভবিষ্যৎ নেই। ভাবের দ্বারা ভাষার অভাব পূরণ করা যায়না। ছন্দের ওপর আপনার দখল বিস্ময়-

বয়। কিন্তু ততঃ কিম্? ও ভাষা অচল, ওকে অলংকার পরানো বৃথা। এ শুধু আপনাকে বলছি তা নয়—সবাইকে। সব চেয়ে বলি রবীন্দ্রনাথকে, কেননা তাঁর কাছে আরও অনেক প্রত্যাশা করেছিলুম। সারা জীবন ছন্দ নিয়ে পরীক্ষা চালালেন, ভাষা নিয়ে পরীক্ষা গত বিশ বছর থেকে বন্ধ। কবিতার ভাষার কথা বলছি। নাচার হয়ে গদ্যকবিতা লিখতে লাগলেন—কিন্তু সেটা তো সমাধান নয়, সেটা সমস্যার পাশ কাটানো। আপনার কবিতার ওজস্বিতা, সাহস, high soaring ভাব আমার ভালো লাগে, পক্ষান্তরে আপনার মনের একটা অংশ morbid বা অসুস্থ। কয়েকটি কবিতায় যে করাল কৃষ্ণছায়া পড়েছে তা objective বিশ্বের নয়, subjective মনের।

দেশের এই ঘনায়মান দুর্যোগে ভাবী রচনার পথ আসছে, কিন্তু যাঁরা লিখবেন তাঁদের লেখনীতে থাকবে মানুষের মুখের লীলায়িত সহজ সুঠাম ভাষা, ক্রিয়াপদগুলি হবে চলতি, সমাসগুলি হবে ভাঙা ভাঙা, কতকটা বৈষ্ণব পদাবলী ও বাউলের গানের মতো সেই হবে তার ঢং। আর তাঁদের মনের কোথাও অন্ধকার থাকবে না, দুর্যোগ যা কিছু তাঁদের মনের বাইরে, বহির্বিশ্বে। অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা তাঁরা এই তিমির জয় করবেন। যেমন অমাবস্যার রাতে দীপান্বিতা তেমনি দক্ষিণায়নের সময় জ্যোতির্ময় সবিতা। Environment-এর দ্বারা তাঁরা কালো হবেন না, environmentই তাঁদের দ্বারা আলো হবে। আমি একখানা ছড়ার বই লিখেছি, একদিন আপনাকে পাঠাবো। নমস্কারান্তে ইতি—

• • •

শীতুদা

২৩-১১-৪২

প্রিয়বরেষু,

আপনার পত্র ও পদ্য পড়ে চমৎকৃত হয়েছি। আপনার কাব্যসাধনা

স্বল্পগতিতে সিদ্ধির সামীপ্য পাচ্ছে। ভাষাও অনেকটা সহজ হ আসছে। * আমাদের দেশে প্রাচীনকালে যে ভাষা প্রচলিত ছিল ত প্রকৃত রূপ প্রাকৃত, আর মার্জিত রূপ সংস্কৃত। তেমনি আমাদের প্রদে বর্তমান কালে যে ভাষা চলতি তার নাম দেওয়া যেতে পারে প্রাকৃ বাংলা। আমি পছন্দ করি প্রাকৃত, যে ভাষা প্রকৃতির নিজের হাতে গ তার মধ্যে আমি পাই রস, গন্ধ, স্বাদ, ফ্রেশনেস, চার্ম। সংস্কৃতকে তাচ্ছিল্য করি তা নয়, শ্রদ্ধা করি তাকে, কিন্তু সে যেন কাগজের ফুল তার আছে রূপ, আছে বর্ণ, তাকে দেখে মুগ্ধ হওয়া যায় কিন্তু 'যেনা নামৃতাস্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্'? তাতে নেই অমৃত। সেই মৃত ভা কাঁধে করে সতীপতির মতো তাণ্ডবনৃত্য করলে যে সাহিত্য হয় সেই স সাহিত্য আমাদের মুষ্টিমেয় শিক্ষিত সজ্জন ছাড়া আর কেউ বোঝে না ভালোবাসেনা, চায়না। সংস্কৃত যে অত সহজে মৃত বা অচলিত হল তা কারণ কি এই নয় যে তার প্রতি দেশের লোকের মমতা ছিল না মমতার অভাব ভক্তি দিয়ে ভরে না। সংস্কৃত বাংলাও সম্ভবত এ শতাব্দীতে গঙ্গালাভ করবে। কাগজ যদি দুষ্প্রাপ্য হয়, ছাপাখানাগুলো যদি বন্ধ হয়ে যায় তবে তার গঙ্গাযাত্রা আসন্ন।

কবিতা সম্বন্ধে আমার ধারণা বলি। কবিতা এমন হওয়া চাই য লোকে স্বেচ্ছায় মুখস্থ বা কণ্ঠস্থ করবে, মনে রাখবে, মানুষের স্মরণেই যার স্থায়িত্ব। তা নয়, বইয়ের পাতায় আবদ্ধ রইল, কেউ হয়তো পড়ল কেউ পড়ল না। এ দশা যেন আমার কবিতার না হয়। ছাপাখানার কল্যাণে আমরা কানের ভিতর দিয়া মরমে পশার সংকেত ভুলেছি। নইলে কবিতা রুনুঝুম গুনগুনিয়ে, তাতে গানের আমেজ থাকতো। যেই শুনতো সেই মুখস্থ করতো। শুনতো সাধারণত আমাদের কাছের লোকেরাই, আমাদের পাড়াপড়শী, আমাদের গাঁয়ের বা শহরের লোক। জনসাধারণ বলতে আমি জনতা বুঝিনে; বুঝিনে দেশশুদ্ধ বালবৃদ্ধবনিতার

ভিড়। প্রতিবেশীরা যদি জানে যে আমি একজন কবি, যদি আমার কবিতা শুনতে আসে, শুনে গুন্ গুন্ করে ও আরো দশজনকে শোনায় তা হলেই আমার কবি হওয়া সার্থক। ছাপাখানার উপর নির্ভর করতে আমি একটুও উৎসাহ বোধ করিনে, কারণ কোন্ দিন ছাপাখানা উঠে যাবে আর আমার কবিতাও যাবে হারিয়ে। তার চেয়ে আমি ঢের বেশি বিশ্বাস করি মানুষের স্মৃতিকে। লোকে যদি আমার রচনা ভালোবাসে তো প্রাণপণে রক্ষা করবে। প্রতিবেশীদের ডিঙিয়ে পণ্ডিতদের সভায় হাজির হ'তে আমি কুণ্ঠিত। কাব্য জিনিষটা মস্তিষ্কধর্মী নয়, হৃদয়ধর্মী। তত্ত্বকথা নয়, প্রিয়কথা। 'মূর্খেতে বুঝিতে পারে, পণ্ডিতে লাগে ধন্দ'।

তারপর কবিতা রচনা একটা আর্ট। আর্ট সম্বন্ধে আমার ধারণা এই যে, আর্ট হচ্ছে অন্তরের লীলা। কিন্তু আমাদের একালের কবিরা লীলা করতে স্ফূর্তি বোধ করেন না, তাঁদের রুচি ব্যায়ামে। তাঁদের মাথায় ঘুরছে আঙ্গিক, অঙ্গভঙ্গী। প্রাণে জাগছে না রস। যাকে বলে abandon বা হাল ছেড়ে দিয়ে রসিকের অনুসরণ, তা এখনকার কবিতায় কই? এ যেন দেবাসুরের সাগরমন্থন, দেখে হাঁফ লাগে। আমি এর মধ্যে নেই আমার নিজের মন বাউল বৈষ্ণব ভাওইয়া ধরণের। আমার আক্ষেপ এই যে তাদের সঙ্গ পাচ্ছিনে। যেন বৃন্দাবন ছেড়ে দ্বারকায় এসেছি। এটা পাখির দৃষ্টিতে প্রগতি বৈকি। আপনারা তো ভাবীকালের সবাইকে এমনি উচ্চ করতে চান। নমস্কারান্তে ইতি—

• • •

বাঁকুড়া

১৮-১২-৪২

প্রিয়বরেষু,

আপনার চিঠি বড় মর্মস্পর্শী হয়েছে। দারুণ অর্থকষ্টে কখনো পড়তে

হেনি আমাকে, তবে গত মহাযুদ্ধের সময় আমার বাবাকে পড়ে হয়েছিল। তাঁর তখনকার আয় আপনার এখনকার আয়ের চেয়ে খু বেশি ছিল না। অথচ পরিবার পরিজন ছিল ঢের বড়। তখনকা কৃচ্ছ্রতার ছাপ এখনো রয়েছে আমার শরীরে। মা তো অকাে গেলেন। স্কলারশিপ না পেলে আমার পড়াশুনা অসম্ভব হ'ত। পেয়ে শরীরের সদ্ব্যবস্থা হয়নি। ঠিক অনশন না করলেও অর্ধাশন করে হয়েছে সারা ছাত্রজীবন।

* * *

আমার বন্ধুরা আমাকে বৈষ্ণব ব'লে ভুল করেন, আসলে আমি স জিয়া। চণ্ডীদাস যা ছিলেন। সহজিয়া সাধনা বৈষ্ণব সাধনার অন্তর্গ কিন্তু সামিল নয়। দান্তের মত আমি চিরদিন বিয়াত্রিচের আরাধনা কে আসছি। আমার "Eternal Feminine" আমাকে তারকা থেকে তারকান্তরে নিয়ে চলেছে—বৃন্দাবন থেকে দ্বারকায় নয়। নমস্কারান্তে ইতি—

* * *

বাঁকুড়া

১৯-১২-৪২

প্রিয়বরেষু,

কাল আপনাকে যে চিঠি লিখেছি আজকের এ চিঠি তা পরিপূরক। কাল বলেছি আমি বৈষ্ণব নয়, সহজিয়া। এ কথা শুনে আপনি হয়তো বলবেন "তফাৎ কী?" তফাৎ কোথায় ভেবে দেখলুম।

বৈষ্ণবদের বিশ্বাস আমরা সবাই নারী—আমিও নারী, আমার স্ত্রী

নারী, আপনিও নারী, আপনার স্ত্রীও। একমাত্র পুরুষ হচ্ছেন ভগবান স্বয়ং, আমরা সেই ব্রজেশ্বরের ব্রজগোপী।

সহজিয়াদের ধারণা আমি পুরুষ, আমার স্ত্রী বা নায়িকা নারী। আমরা দু'জনেই পরস্পরের ভগবান। আমরা দু'জনেই Eternal Masculine ও Eternal Feminine। অবশ্য এটা আক্ষরিক অর্থে ধরলে বিপদ। কেননা আমরা সামান্য প্রাণী—যেমন আরো দশজনে। তবু সবঘটে ভগবান আছেন, এই সামান্য আধারেও। লোকে বলবে এই আশঙ্কায় সহজিয়ারা নিজেদের প্রণয়লীলাকে রাধাকৃষ্ণলীলা নাম দিয়ে কবিতা লিখেছেন। সেসব কবিতা বৈষ্ণব কবিতা বলে বিখ্যাত হয়েছে। চেনবার উপায় নেই শত শত কবিতার মধ্যে কোনটি সহজিয়া ও কোনটি বৈষ্ণব। তবে সূক্ষ্ম বিচার করলে পার্থক্য টের পাই বৈকি।

সুফীদের সঙ্গে বৈষ্ণবদের মিল আছে। পাশ্চাত্য mysticদের সঙ্গেও। তাঁরাও আপনাদের নারী ব'লে কল্পনা ক'রে থাকেন। রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি' 'গীতিমাল্য' ও 'গীতালি' এই সুরে লেখা। বৈষ্ণব তত্ত্বের মধ্যে নিশ্চয় কিছু সত্য আছে, নইলে এত ব্যাপক প্রচার হ'ত না। মানব হৃদয়ের কোনো একটা গভীর প্রদেশে তা প্রত্যক্ষরূপে সত্য, আমি তদ্দূরে যাইনি। যেতে প্রস্তুত হইনি, বোধ হয় কোনোদিন হ'ব না। আমি ভাবতেই পারিনে আমি ও আমার প্রিয়া দু'জনেই কী করে নারী হ'তে পারি। তা যদি হই একজন অপরজনের কাছে বাহুল্য হয়ে পড়ি। পরস্পরকে সম্পূর্ণতা দিতে পারিনে। পুরুষের চরিত্রে পৌরুষের বিকাশ হয় না, যদি সে নারীর চোখে পুরুষ না হয়। নারীর স্বভাবে নারীত্বের বিকাশ হয় না, যদি সে পুরুষের চোখে বিশিষ্ট না হয়, হয় সাধারণ। বৈষ্ণব তত্ত্বকে আঘাত না করে এটুকু আমি বলতে চাই যে "বৈষ্ণব সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।" আমার মা বাবা বৈষ্ণব দীক্ষা নিয়েছিলেন, আমি জানি তাঁদের সাধনায় আত্মবিলোপ (self-effacement)

আত্মদান (self-surrender) প্রভৃতি পরম গুণ আছে। কিন্তু এ ব্যব-স্থায় স্ত্রীপুরুষের সত্যসম্পর্ক অবিকশিত থেকে যায়, এই আমার সিদ্ধান্ত। হতে পারে ভুল বুঝেছি। ইতি—

• • •

বাঁকুড়া

১৪-১-৪৩

প্রিয়বরেষু,

যে দুঃস্বপ্নের মধ্যে আপনি বাস করছেন তার প্রান্তভাগে আমিও। বোমার চেয়েও মারাত্মক বিপদ আছে, তার জন্তে মনটাকে প্রস্তুত রাখতে হবে। বিশ্বাস জিনিষটা মেরুদণ্ডের মতো। তার পরীক্ষা প্রতিদিনই অলক্ষ্যে চলেছে। শেষ পর্যন্ত যদি খাড়া রইতে পারে তবেই আমরা মানুষ নতুবা চতুষ্পদ। খাড়া মেরুদণ্ড ছাড়া মনুষ্যত্বের আর কী সংজ্ঞা হতে পারে

* তা বলে practical না হওয়াটাও ভুল। স্ত্রীর যদি মানসিক আঘাত পেয়ে মস্তিষ্কবিকৃতির ভয় থাকে তবে এই বোমার মরশুমে তাঁকে কলকাতার বাইরে অথচ অদূরে স্থানান্তরিত করতে হবে, যদি সাধ্যে কুলায়। তবে পুরুষমানুষের পক্ষে কলকাতা ত্যাগ সমীচীন হবে না। "উলুখড়ের" অপেক্ষায় আছি। "ইন্দ্রপ্রস্থ" বেশ হয়েছে। কলকাতার অন্য নাম নয় তো? *

কলম আমাদের পাখা। দুঃসময়ে কি বিহঙ্গ তার পাখা বন্ধ করবে? কোনো কবির যদি তেমন শঙ্কা দেখি তবে তাঁকে আমি কবির ভাষায় বলবো "এখনি অন্ধ বন্ধ কোরো না পাখা"। আমি তো মনে করি এইটেই পাখা চালানোর সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। সুতরাং প্রাণ-খুলে লিখে যান। ছাপা হোক বা না হোক।

ব্যক্তি ও সমষ্টির তর্ক যুগে যুগে শোনা গেছে। দুই-ই সমান সত্য। আমিও আছি সমষ্টিও আছে। কেউ কারুর স্থান পূরণ করতে পারে না, সুতরাং কেন এ দ্বন্দ্ব? জীবন চিরকাল প্রবহমান। ব্যক্তির জীবন লোক লোকান্তরে, জন্ম জন্মান্তরে। সমাজের জীবন ইহলোকে, মর্ত্যে। ব্যক্তির জীবনের সবটা দৃশ্যমান নয় ব'লে অজ্ঞেয়বাদী হওয়া যাবে, কিন্তু নেতিবাদী হওয়া যাবে না। ইতি—

• • •

প্রিয়বরেষু,

……সংস্কৃত কাব্য rhythmএর শেষ সীমা পর্যন্ত গিয়েছিল জয়দেবের পূর্বেই। তিনি তাকে rhymeএর শেষ প্রান্তে পৌঁছে দিলেন। তা সত্ত্বেও সংস্কৃত কাব্যের আর অগ্রগতি হ'ল না, কারণ ভাষায় ঘুণ ধরেছিল। জনমুখের ভাষা ও লেখনী মুখের ভাষা দুই স্বতন্ত্র ভাষার মতো ব্যবধান বাঁচিয়ে চলতে চলতে এক সময় পর হয়ে গেল। সংস্কৃত রইল পুঁথির পাতায়, প্রাকৃত রূপান্তরিত হ'ল বাংলা ইত্যাদি প্রাদেশিক ভাষায়, সেসব ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি হ'ল। গোড়া থেকে গড়ে তুলতে হ'ল ছন্দ, মিল, rhythm, rhyme। ক্রমে একটা সময় এল যখন বাংলা কবিতার ছন্দ ও মিল কালিদাস জয়দেবের মতো নিখুঁৎ হ'ল। আপনি সেই নিখুঁৎকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছেন। তাকে অক্ষুণ্ণ রেখেছেন, তাকে আধুনিকতার পরিপন্থী ভেবে পরিহার করছেন না। এখানে আপনার প্রাজ্ঞতার পরিচয় পাচ্ছি ও প্রশংসা করছি। নিখুঁতের ওপর আর এক কাঠি সরেস হ'লে আপত্তি করবো না, তারিফ করবো। কিন্তু 'এহো বাহ্য'। আরো গভীরে গেলে দেখবেন কবিতাকে সার্থক করে Poetic Feeling ও Poetic Vision. এ

দু'য়ের অভাবে ছন্দ ও মিল ব্যর্থ। আপনার রচনায় Poetic Feeling আছে কিন্তু Visionএর অনটন। Poetic Visionএর অভাব Political Vision বা Historical Vision দিয়ে ভরে না।

কিন্তু "এতো বাজে।" আরো গভীরে নামলে দেখবেন কবিতার উৎস আনন্দ। "আনন্দাৎ খলু ইমানি ভূতানি জায়ন্তে"। কাব্যও তো সে অর্থে ভূত। আনন্দের উৎস প্রত্যেকের অন্তরে বিদ্যমান। কিন্তু সে উৎসের মুখ খোলা থাকলে আমাদের আপিস আদালত করা, রুজি রোজকার করা অসম্ভব হয়। সকলে কিছু জমিদার নয় যে দিবারাত্র কাব্যলক্ষ্মীর সহবাস ক'রে আনন্দে কাটাবে। আমরা আজ-কালকার কবিরা অর্থোপার্জনের অবসরে কবিতা লিখি। আমাদের যখন অবসর ঠিক সেই সময়েই যে আনন্দের জোয়ার আসবে তা হয়ে ওঠে না। যেই জোয়ার আসে অমনি আপিসের ঘণ্টা বাজে। অমনি ভাঁটা পড়ে। আমি তো কিছুতেই কবিতার সময় আনন্দ, আনন্দের সময় কবিতা খুঁজে পাই না। চাকরী ছাড়বার কথা কতবার ভেবেছি কিন্তু সাহসে কুলোয়নি। কেননা আমার পৈত্রিক সম্পত্তি বলতে বিশেষ কিছু নেই, থাকলেও শরিক আছে। খেটে খেতে হবে যখন, তখন এই বা মন্দ কী? সাম্যবাদী আমলে যদি এর চেয়ে বেশী অবসরের আশা থাকতো তা হলে সাম্যবাদী হতে আমার বাধতো না।

যে সমস্যার কথা জানালুম এর মীমাংসা না হ'লে কবিদের সঙ্গে আনন্দের বিচ্ছেদ ঘুচবে না। মাঝে মাঝে একটু আধটু সরবে উৎস মুখের পাথরটা। এক আধটা ভালো কবিতা উঠে আসবে। তাতে আর কতটুকু প্রগতি হবে? অগত্যা প্রগতির নামে অধোগতি বা চক্রগতি বা বক্রগতিই আমাদের গতি! অল্প অবসরে যে যত বড় চালাক সে তত বড় আধুনিক। এই Clevernessই আধুনিক কবিদের সম্বল। এটাকে আমি দুর্বলতা মনে করি। আপনি এর থেকে মুক্ত।

আমার প্রীতি নমস্কার ও শুভাকাঙ্ক্ষা জানবেন। আশা করি সস্ত্রীক ভালো আছেন। ইতি—

এই পত্রগুলি কবি বিমলচন্দ্র ঘোষকে লেখা।

জবানবন্দী

সাহিত্যে কিছু না কিছু পরিবর্তন সব সময়েই হচ্ছে। তবে গত মহাযুদ্ধের পর বাংলা সাহিত্যে যে পরিবর্তন দেখা গিয়েছিল বর্তমান মহাযুদ্ধের পর সেরকম উল্লেখযোগ্য কোনো পরিবর্তন দেখছিনে। আগের বারে যুদ্ধের অভিজ্ঞতা নিয়ে যাঁরা ফিরে এলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন নজরুল ইসলাম। এই সময় প্রবাসী প্রভৃতি মাসিক পত্রিকা-গুলির সমৃদ্ধিও উল্লেখযোগ্য। তারপর কল্লোল। কল্লোলকে আশ্রয় করেই গোকুলচন্দ্র নাগ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের সাহিত্যে আবির্ভাব। অসহযোগ আন্দোলন নিয়ে এলো নতুন আদর্শ—নতুন আকাঙ্ক্ষা। এই পরিবর্তনের সুর সংক্রামিত হলো জীবন থেকে সাহিত্যে। কিন্তু এবারের মহাযুদ্ধ এরকম কোনো পরিবর্তন আনেনি। অবশ্য এ মহাযুদ্ধের বৈশিষ্ট্য এই যে এ যুদ্ধ এখনও শেষ হয়নি। কেবলমাত্র সাময়িক বিরতি চলছে। তবে কল্লোলের যুগের লেখকদের থেকে আধুনিক সাহিত্যিকরা বেশী সমাজসচেতন।

সমাজের কোনো ছবি আঁকা অথবা পরিবর্তন ঘটানোই সাহিত্যিকের আসল লক্ষ্য নয়। অবশ্য তারও একটা মূল্য আছে। তার লক্ষ্য জীবনের সুখের অথবা দুঃখের কোনো অনুভূতিকে প্রকাশ করা। কাজেই সমাজের সঙ্গে শিল্পীর যে সম্পর্ক তা পরোক্ষ। প্রত্যক্ষ নয়। অধিকাংশ ছোট গল্পই কোন কৌতূহলকে নিবৃত্ত করে। সেই সঙ্গে সমাজকে যতটুকু পাওয়া যায় তা গৌণ। সাহিত্যে রসের স্থান সবার আগে। প্রচারমূলক সাহিত্যেও আপত্তির কিছু নেই যদি তা রসোত্তীর্ণ হয়। প্রকাশই লক্ষ্য, প্রচার নয়। লেখক যখন সত্তার গভীরে নেমে

শিল্প সৃষ্টি করেন, সে সৃষ্টি কেবল তাঁর ব্যক্তিগত নয়। তা সার্বজনীন হয়ে ওঠে। না হলে লেখকের সৃষ্টি সাধারণের মনকে স্পর্শ করতে পারেনা।

যদি বলেন রাজনীতির সঙ্গে সাহিত্যের কী সম্পর্ক তবে বলব দুটো স্বাধীন রাজ্যের মধ্যে যে সম্পর্ক তাই। রাজনীতি সাহিত্যে এলে তাকে তো শিল্পরূপ নিয়ে আসতে হবে। এখনকার সাহিত্যিকরা রাজনীতির সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে পড়ছেন যে নিজেদের রাজনীতি থেকে আলাদা করে নিতে পারছেন না। সাহিত্যিক রাজনীতিক হতে পারেন। কোনো মানুষকেই বিশেষ একটা গণ্ডীতে আবদ্ধ করা চলে না। একই ব্যক্তির বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিচয়। সাহিত্যিক যখন রাজনীতি করেন তখন সাহিত্যিক হিসেবে করেন না। সাহিত্য সেবাদাসী নয়, রাণী। তার দাবী অগ্রগণ্য। মহাত্মা গান্ধী ব্রত নিয়েছেন দেশকে স্বাধীন করবার। কিন্তু তিনি যদি সাহিত্যের মধ্য দিয়ে সে ব্রতকে সফল করতে চান তবে তাঁকে সাহিত্যের দাবী মেনে নিতে হবে সবার আগে। আর তা হলে হয়তো দেখা যাবে তিনি তাঁর উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হয়েছেন। সাহিত্য সাহিত্যের জন্যেই। সাহিত্য এবং রাজনীতি দুটোই করতে গেলে কোনোটাই হবে না। যদি Capitalistদের ধ্বংস করতে হয় তবে বন্দুক তুলে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু একান্ত সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে করতে গেলে লক্ষ্যে পৌঁছনো প্রায় অসম্ভব। সাহিত্যও লাভবান হবে না। কোনো রচনা একই সময়ে সাহিত্য ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় স্বরূপ হয়েছে এ উদাহরণ বিরল।

কোন্ শ্রেণীর সাহিত্যিকদের সাহিত্যিক সম্ভাবনা বেশী এর উত্তরে বলা চলে sensitiveদের। সূক্ষ্ম বোধ আর গভীর অনুভূতি ছাড়া বড় সাহিত্য হতে পারে না। কিন্তু সাধারণত এঁদের অনেকেই জীবনযুদ্ধে তলিয়ে যান আর্থিক ও সামাজিক আনুকূল্যের অভাবে। যাঁরা বেঁচে

আছেন তাঁদেরও সাহিত্যিক সত্তা সাধারণত মুমূর্ষু বা মৃত। কেউ বা পাকা ব্যবসাদার হয়ে বসেছেন অথবা এই রকম আর কিছু। গভীর হৃদয়বৃত্তি নিয়ে প্রথম জীবনে অনেকেই সাহিত্যক্ষেত্রে আসেন বটে কিন্তু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাকে বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছেন এরকম দৃষ্টান্ত খুবই কম। হয়তো সাহিত্যের কোনো কুকতাক তাঁদের জানা আছে যার ফলে তাঁদের বই ভালো চলে। কিন্তু এই পর্যন্তই। অনেকে কেবল বুদ্ধিবৃত্তিকে সম্বল করেই সাহিত্য ক্ষেত্রে নামেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে পূর্ণতা নেই। বুদ্ধির সঙ্গে চাই অনুভূতি। অনুভূতি এবং কল্পনাকে বাদ দিয়ে কেবলমাত্র বুদ্ধি নিয়ে স্থায়ী সাহিত্য হয় না।

জিজ্ঞাসা করছেন আধুনিক কোন্ কোন্ লেখক সম্বন্ধে আমি আগ্রহশীল? সবচেয়ে আগ্রহ ছিল সুকান্ত সম্বন্ধে। তাঁর জীবন ফুরিয়ে গেছে। শুধুমাত্র কারও লেখা পড়েই আমি খুশি হতে পারিনে। লেখকের জীবনযাত্রা সম্বন্ধেও আমার কৌতূহল অত্যন্ত বেশী। এমন সাহিত্যিক চাই যার জীবন থেকে হবে সাহিত্য। জীবনের অভিজ্ঞতাকে সাহিত্যের কাজে লাগাতে হবে।

কবিদের সম্বন্ধে আমার অভিযোগ তাঁদের অধিকাংশের কবিতায়ই দেখি কেবল কথার প্রাধান্য। কাব্যের সুর তাতে নেই। শুধু কথার যে কোনো দাম নেই আমি তা বলছিনে। কথার আকস্মিকতা পদে পদে মনকে নাড়া দিয়ে যায়। এই জন্যেই ছড়া আমার ভালো লাগে। তবে কবিতায় কথার প্রাধান্য সীমাবদ্ধ হওয়াই উচিত। না হলে সুর ব্যাহত হয়। এই সুরবোধের প্রাধান্যই ছেয়ে আছে জসীমউদ্দীনের কাব্যকে। তাঁর কবিতায় এক অপূর্ব গ্রাম্য সুরের মধুর বিস্তার দেখতে পাওয়া যায়।

কবিদের সম্বন্ধে ব্যক্তিগত মত বলতে গেলে নজরুলের স্থান আমার কাছে অত্যন্ত উঁচুতে। তাঁর অনুভূতির আবেগ দূরপ্রসারী। ভালো

লাগে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অনেক কবিতা, মোহিতলালের বিস্মরণী, প্রিয়ম্বদা দেবীর, উমা দেবীর এবং অপরাজিতা দেবীর কিছু কবিতা। প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রথমা, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের অমাবস্যা। গোকুলচন্দ্র নাগের পথিক, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিত্রবহা, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পথের পাঁচালী, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের গল্প, প্রবোধকুমার সান্যালের গল্প এবং শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের গল্প আমার ভালো লেগেছে। রাখালচন্দ্র সেনের সত্যবাদিনী একটি উল্লেখযোগ্য কাহিনী। গল্পের ক্ষেত্রে কাজী আবদুল ওদুদের অনুভূতির গভীরতা ব্যাপক এবং তাবার বয়ন অদ্ভুত। মাহবুব উল আলম, আবুল ফজল এবং আবু সৈয়দ আয়ুবও ক্ষমতার অধিকারী। প্রেমেন্দ্র মিত্রের কয়েকটি গল্প এবং সুবোধ ঘোষের ফসিল আমার ভালো লেগেছে। ফসিলের লেখক জীবনকে দেখেছেন। অনুভব করেছেন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প উপন্যাস পড়েছি আগ্রহ নিয়ে। প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর মহাস্থবির জাতক ও সতীনাথ ভাদুড়ীর জাগরী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বনফুলের শ্রীমধুসূদন একখানি অগ্রগণ্য নাটক। বুদ্ধদেব বসুর কবিতা ও গল্প শিল্পকৌশলে অদ্বিতীয়। কবিদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো লাগে বিষ্ণু দে ও অজিত দত্তকে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মানদীর মাঝি অপূর্ব বই। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের ও অমিয় চক্রবর্তীর বৈদগ্ধ্য আমাকে মুগ্ধ করে। আমার সঙ্গে স্বাভাবিক মিল (affinity) দিলীপকুমার রায় ও মণীন্দ্রলাল বসু এ দুজনের। এঁদের লেখা আমি ভালোবাসি। এঁরা আমার বন্ধু।

নিজের লেখা সম্পর্কে আমার মতামত কী, এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া মুশকিল। তবে সম্প্রতি যে সব গল্প আমি লিখেছি তার মধ্যে দুকানকাটা আমার নিজের ভালো লেগেছে। আমার পরীক্ষা এই গল্পের মধ্যে কিছুটা সার্থক হয়েছে বলেই আমার ধারণা।

পথেপ্রবাসের মধ্যে আমার জীবনদর্শনকে পাওয়া যাবে

পরবর্তী প্রশ্ন, পাঠকদের অথবা প্রকাশকদের সম্পর্কে আমার কোনো অভিযোগ আছে কিনা। না, নেই। আমার মনে হয় পাঠকরা আমাকে সাদরেই গ্রহণ করেছেন। প্রকাশকদের সম্পর্কেও সেই একই কথা। তবে অনেক সময় মনে হয়েছে তাঁরা যেন ঠিক উপযুক্ত যত্ন নিয়ে বই প্রকাশ করেননি।

সাহিত্যিকদের সম্পর্কে রাষ্ট্রের দায়িত্ব কতটুকু এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া একটু শক্ত। তবে আমার কথা বলতে পারি, সব কাজ থেকে মুক্তি দিয়ে জীবনযাত্রার সামান্য কিছু ব্যবস্থা করে সাহিত্যচর্চার অবকাশ আমাকে দেওয়া হয় তাহলে তাই আমার কাম্য। কিন্তু অপর দিকে সাহিত্যিকরা রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীনে এসে পড়লে তাদের স্বতঃস্ফূর্ততা যাবে নষ্ট হয়ে। লেখা হবে ফরমায়েসী। আমার লেখা পড়ে পাঠক খুশি হয়ে আমাকে দক্ষিণা দেবে, সেই দক্ষিণায় আমার জীবনযাত্রা নির্বাহ হবে এটাই আদর্শ হওয়া উচিত। কিন্তু আমাদের যা পাঠক-সংখ্যা তাতে জীবনযাত্রার জন্যে অর্থ উপার্জন করতে হলে বেশী লিখতে হবে। আর তাহলেই লেখা খারাপ হতে বাধ্য। আমাদের পাঠক সংখ্যা যে সীমাবদ্ধ তার জন্য সমাজব্যবস্থা দায়ী। সমাজকে এমনভাবে গড়তে হবে যার ফলে প্রত্যেকে ভালো লেখাপড়া শিখবে এবং ভালো সাহিত্য বুঝবে। বুঝে তার দাম দেবে। এখন যেমন দাম দেয় ভালো গয়নার ভালো শাড়ীর, তখন দাম দিতে শিখবে ভালো কবিতা ও গল্পের।

লক্ষ লক্ষ লোক যদি এই পর্যায়ে উঠতে পারে তবে লেখকরাও যথেষ্ট দক্ষিণা পাবেন। কাজেই রাষ্ট্রের প্রতি নির্ভরশীল না হয়ে পাঠকের প্রতি নির্ভরশীল হওয়াই সাহিত্যিকের উচিত। তবে যদি কোনো সাহিত্যিক অসুস্থ অথবা অকর্মণ্য হয়ে পড়েন তখন রাষ্ট্রের কর্তব্য তাঁর জীবিকার দায়িত্ব গ্রহণ করা। সুস্থ অবস্থায় আমরা অন্য কোনো কাজ করব আর

তারই মধ্যে সাহিত্যের জন্তে অবকাশ করে নেবো—এটাই আপাতত আমাদের করণীয়। তবে সাহিত্যকে আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করতে হবে।

অনেকের দেখা যায় কাজের ফাঁকে ফাঁকে দু একটা লেখা ভালো বেরিয়ে গেল। কিন্তু পুরোপুরি আন্তরিকতার সঙ্গে সাহিত্যকে তাঁরা গ্রহণ করেননি। অর্থই প্রাধান্ত লাভ করেছে। অর্থকে প্রাধান্ত দিলে সাহিত্যের অবনতি হবেই।

সিনেমার কথা ধরা যাক। যাঁরা সিনেমার দিকে চোখ রেখে সাহিত্যের সৃষ্টি করেছেন তাঁদের হাতে কি সাহিত্যের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকছে? না, থাকছে না। সাহিত্যের জন্তেই বই লিখতে হবে। তারপর যদি সে বই সিনেমা হয় আপত্তি নেই। তা বলে সিনেমার জন্তে বই লিখলেই সে বই খারাপ হবে এমন কথা বলছিনে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাই দেখা যাচ্ছে। এমন অনেক বই আছে যা সিনেমায় ভালো হয়েছে অথচ সাহিত্য হিসেবে একেবারে উৎরায়নি। সিনেমা সাহিত্যিকদের মস্ত বড় প্রলোভন। হয়তো এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে আর্থিক সমস্যা। কিন্তু এ সমস্যার সমাধান হলেও এ প্রলোভনের হাত থেকে রেহাই পাওয়া শক্ত।

আপনাদের শেষ প্রশ্ন আমার সাহিত্যিক জীবনের স্মরণীয় ঘটনা। কিন্তু ঘটনার স্মরণীয়তা শুধু সাহিত্যিক বলেই হয় না। ধরুন প্রেম। এ তো জীবনের একটি বড় স্মরণীয় ঘটনা। কিন্তু এ ঘটনা যখন ঘটল তখন আমার সাহিত্যিক সত্তা কোথায়? হয়তো আত্মপ্রকাশই করেনি। কাজেই ঘটনার স্মরণীয়তা মানুষ হিসেবেই নির্ণয় করা ঠিক নয় কি? সাহিত্যিক এই ঘটনাকে অন্যের কাছে তুলে ধরতে পারে এই পর্যন্ত। কিন্তু সেও অত্যন্ত কঠিন কাজ। ধরুন আমার একটি ছেলে মারা গেছে। শোকের গভীরতা হৃদয়কে মুহ্যমান করে দিয়ে গেছে। আমি চেয়েছি

এ অনুভূতিকে সাহিত্যে রূপ দিতে। কিন্তু পারিনি। কারণ তাহলে দ্বিতীয়বার আমাকে সেই দুঃসহ শোকের দাহকে অনুভব করতে হবে। একাজ অত্যন্ত কঠিন। আমার পক্ষে অসম্ভব। আবার আনন্দের ঘটনা দেখুন। বিয়ের পর প্রথম রাত্রির আনন্দকে সাহিত্যে প্রকাশ করতে হলে দ্বিতীয়বার আমাদের সেই অনুভূতির রাজ্যে ফিরে যেতে হবে। কিন্তু এও অত্যন্ত কঠিন। তবে অন্যের কথা আমরা কল্পনার সাহায্যে লিখতে পারি। রবীন্দ্রনাথকে দেখুন। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের কতটুকু প্রতিফলন সাহিত্যে দেখেছি? অপেক্ষাকৃত কম গভীর অনুভূতিকে আমরা প্রকাশ করতে পারি। এর বেশী আমাদের ক্ষমতার বাইরে। চিন্তাপ্রধান লেখার থেকে অনুভূতিপ্রধান লেখা আরও দুরূহ। পথে প্রবাসে লেখার সময় অনেক গভীর বেদনার মধ্য দিয়ে গিয়েছি আমি। আমি যে হেসেছি—ফূর্তি করেছি এটাই আশ্চর্য মনে হয়েছে। কিন্তু এই সবকিছুর পেছনে আছে এক গভীর বেদনাবোধ। প্রত্যেক মহৎ সৃষ্টির পেছনেই বেদনার অনুভূতি কাজ করে যাচ্ছে। হয়তো সব সময় তা পরিস্ফুট নয়। তবু তার প্রকাশ ছড়িয়ে আছে লেখার মধ্যে।

১৯৫৭

শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ও নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সহিত প্রশ্নোত্তরকালে দেবদাস পাঠক কর্তৃক অনুলিখিত ও পরে ঋতু রায় কর্তৃক সংশোধিত।

আমাদের সংগ্রাম

আমি মানবচরিত্রে বিশ্বাস হারাইনি, কারণ মানবচরিত্র অনন্ত সম্ভাবনায় ভরা। আজ যে শয়তান কাল সে সাধু, এ রকম তো মাঝে মাঝে দেখা যায়। নোয়াখালীর পরে আমার নিজেরই মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল, এখনো মন খারাপ। তা হলেও আমি মানবচরিত্রে বিশ্বাস হারাইনি, হারাব না কোনোদিন। বহুকাল আমি হিন্দু-মুসলমান উভয়ের সেবা করেছি। সাহিত্যিক হিসেবে আমি উভয়ের জন্যে লিখি। একথা আমি ভাবতে পারিনে যে আমার লেখা শুধু হিন্দুরা পড়বে, মুসলমানরা পড়বে না। একদিন সাম্প্রদায়িকতার আগুন থামবে। উভয়ের মধ্যে যাঁরা হৃদয়বান, মনস্বী, চরিত্রবান তাঁরা হাত মেলাবেন। জনগণকে আমি চিনি। তারা অজ্ঞ হলেও নির্বোধ নয়। তারা আজ না বুঝলেও কাল বুঝবে কারা তাদের সত্যিকার বন্ধু, কারা কপট বন্ধু। তারা যদি বিভ্রান্ত না হতো, এসব দুষ্কর্ম নানাস্থানে অনুষ্ঠিত হতো না। তাদের তথাকথিত বন্ধুরা তাদের বোকা বানিয়েছে, কিন্তু চিরকাল বোকা বানাতে পারবে না। "You can fool all people for some time. You can fool some people for all time. But you cannot fool all people for all time." আজকের নেতারা কাল কোথায় তলিয়ে যাবেন, কোথায় মিলিয়ে যাবে তাঁদের অলীক মরীচিকা। জনগণ তখন হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে গড়ে তুলবে তাদের প্রজারাজ্য। সে রাজ্যের একটি অঙ্গ কৃষক, আরেকটি শ্রমিক, আরেকটি কারিগর ও আরেকটি কবি। আমাদের কণ্ঠস্বর আজ কারো কানে পৌঁছচ্ছে না, আমি তো লেখা ছেড়ে দিয়েছি

বললেও চলে। একদিন আমাদের কণ্ঠস্বর জনগণ সাগ্রহে শুনবে। আমাদের ডেকে নিয়ে সভা করবে। আজ আমি ধ্যানস্থ। আপনাকেও বলি ধ্যানস্থ হতে। সামনে হয়তো একটা গৃহযুদ্ধ আসছে। তাতে হয়তো আমরা বাঁচব না। কিন্তু বাঁচি আর মরি, ভবিষ্যতেও ধ্যান করবো। তার জন্যে প্রস্তুত হব। এবং সময় উপস্থিত হলে, তার নেব।

……বিশ্বাস বজায় রাখাটাই আমাদের সংগ্রাম।

১২ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৭

কলিকাতা

পত্রখানি 'মানুষের মানচিত্র' পুস্তকের রচয়িতা আবদুর রহমানকে লিখিত।